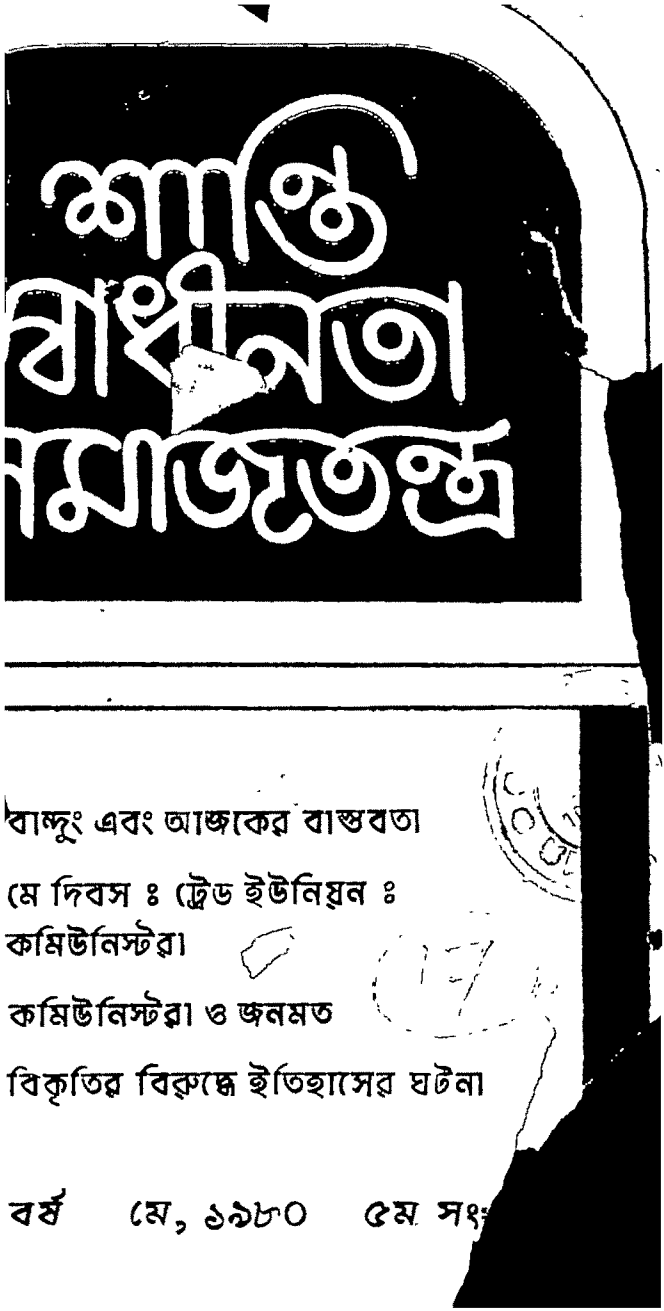

বান্দুং এবং আজকের বাস্তবতা

মে দিবস ঃ ট্রেড ইউনিয়ন ঃ
কমিউনিস্টরা

কমিউনিস্টরা ও জনমত

বিকৃতির বিরুদ্ধে ইতিহাসের ঘটনা

বর্ষ মে, ১৯৮০ ৫ম সং

CWK-H05282-17-P36251

শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র

৮ম বর্ষ | মে, ১৯৮০ | ৫ম সংখ্যা

সূচীপত্র

সারদা মিত্র : বান্দুং এবং আজকের বাস্তবতা ৩

S. Mitra : Bandung and Present Day Realities, W. M. R

কেমাল কেরভান : মে দিবস : ট্রেড ইউনিয়ন : কমিউনিস্টরা ২২

K. Kervan : May day : Trade Unions : Communists, W. M. R

পার্টি

: শ্রমিকরা ধর্মঘটের শিক্ষা ব্যাখ্যা করছেন ৩৩

: Workers Analyse Strike Lessons W. M. R

মতামত

সত্যজায়া সুদিমান : তিরিশে সেপ্টেম্বর : সত্য ও মিথ্যা ৩৬

S. Sudiman : September 30 : Truth and Lies W. M. R

মত-বিনিময়, আলোচনা

: শ্রমিকদের "অংশগ্রহণ" প্রসঙ্গে কমিউনিস্ট অভিমত ৪৪

: The Communist View of Worker "Perticipation", W.M.R

: কমিউনিস্টরা ও জনমত ৭০

: The Communists and Public Opinion, W. M. R

পত্র-পত্রিকা

ওলেগ রঝেশেভস্কি : বিকৃতির বিরুদ্ধে—ইতিহাসের ঘটনাবলী ৮৯

O. Rzheshevsky : Facts of History—Against Distortions, W. M. R

তথ্য ও সমীক্ষা

: শ্রেণী সংগ্রাম ফ্রন্ট ১০৫

: On the Class Battle Front, W. M. R

P3625

সম্পাদক : জ্যোতি দাশগুপ্ত

প্রাপ্তিস্থান
মনীষা গ্রন্থালয় প্রাঃ লিমিটেড
৪/৩বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলকাতা-৭৩

সম্পাদকীয় দপ্তর
৪/৩এ, ওরিয়েন্ট রো
কলকাতা-১৭
৪৪-৮৭৬৬

মূল্য : ১·০০ [এক টাকা]

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য পরিষদের পক্ষে ২০৮, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-১২ থেকে অজয় দাশগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত ও কালান্তর প্রেস, ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭, অনিল ভঞ্জ কর্তৃক মুদ্রিত।

বান্দুং এবং আজকের বাস্তবতা

সারদা মিত্র
সদস্য, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় পরিষদ

২৫ বছর আগে একটি নতুন শব্দ আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অভিধানে প্রবেশ করে। এই শব্দটি হলো 'বান্দুং'। এশিয়া ও আফ্রিকার মহাদেশ-দ্বয়ের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিণতি এই ভৌগোলিক নামকরণের মধ্য দিয়ে সংজ্ঞা পায়। বান্দুং হচ্ছে ইন্দোনেশিয়ার একটি মনোরম ও আতিথেয়তাপূর্ণ সহর। ১৯৫৫ সালে এখানে যে আফ্রো এশীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তা থেকে এই সহরটি পেয়েছে নতুন প্রভা।(১)

আমরা যে শতাব্দীর এক চতুর্থাংশ চলে যাবার পরেও আবার এই ঘটনার দিকে ফিরে তাকাচ্ছি, সেটা কিসের তাগিদে? এ বিষয়ে দ্বিমত হবার কোন অবকাশ নেই যে, বান্দুং সম্মেলনই সেই বিশাল আন্তর্জাতিক শক্তির জন্ম সূচিত করেছিল, যাকে "ঔপনিবেশিক ও আধা ঔপনিবেশিক পরনির্ভরতা থেকে মুক্তির জন্যে সংগ্রামী দেশগুলির আন্দোলন" বলে অভিহিত করা যায়। বান্দুং সম্মেলনই বিস্তীর্ণ গণতান্ত্রিক সমাবেশের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির প্রথম আন্তর্জাতিক কার্যক্রম। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের আন্তর্জাতিক গতিপরিণতির কতকগুলি মৌল প্রবণতাকে যে বিশিষ্ট এশীয় এবং আফ্রিকীয় রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দ চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন, বান্দুং সম্মেলনের সমাপনী ঘোষণা আজও তাঁদের স্বচ্ছ দৃষ্টির সাক্ষ্য দিচ্ছে।

এই সম্মেলনে যোগদানকারীরা জরুরী মানবিক অধিকার ও নিপীড়িত জাতিসমূহের অধিকার রক্ষার জন্যে বক্তব্য পেশ করেন, সমস্ত জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের ন্যায়সঙ্গত অধিকারকে বাস্তবায়িত করার দাবী জানান এবং বর্ণবৈষম্য ও পৃথকীকরণের জঘন্য রীতির নিন্দা করেন। উপরন্তু, যদিও সমাপনী ঘোষণায় সরাসরি সাম্রাজ্যবাদের নাম উচ্চারণ করা হয় নি, তবু এর

১ বার্মা, শ্রীলংকা, ভারত, ইন্দোনেশিয়া এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীদের আহ্বানে ১৯৫৫ সালের ১৮ই থেকে ২৪শে এপ্রিল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে আহ্বায়ক দেশগুলি ছাড়া ২৪টি এশীয় এবং আফ্রিকীয় দেশ যোগ দিয়েছিল।

অনেকগুলি প্রস্তাবনা সুস্পষ্টভাবেই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ছিল।(২) একটা দৃষ্টান্ত হলো, সম্মেলন "বৈদেশিক শাসন ও আধিপত্য ও শোষণে বিভিন্ন জাতির হয়রানির" জোরালো নিন্দা করেছিল। সম্মেলনের সমাপনী ইশ্‌তেহারে বলা হয়, "উপনিবেশবাদ তার যে কোন রকম-ফেরের মধ্য দিয়েই এমন একটা অশুভ ব্যাপার, যার পরিসমাপ্তি ঘটাতে হবে একান্ত ভাবে।"

বহু বছর ধরে বান্দুং সম্মেলনের এই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী পথ-নির্দেশক সূত্রগুলি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশসমূহের যৌথ প্রয়াসের মূলমর্মকে নির্দেশিত করেছে।

আরও বলা যায়, বান্দুং এশিয়া এবং আফ্রিকার ইতিহাসে সেই প্রথম সমাবেশ-ক্ষেত্র যেখান থেকে সর্বোচ্চ স্তরে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, এই দুই মহা দেশের সমস্ত দেশ ও জাতি শান্তিতে বসবাস ও কাজ করার এবং একটা শান্তিপূর্ণ ভবিষ্যৎকে পাবার জন্যে সংকল্পবদ্ধ। সেই সময়ে স্নায়ুযুদ্ধের পরিস্থিতি পারমাণবিক অস্ত্রের যুদ্ধের আশঙ্কায় সঙ্গীন হয়ে উঠেছিল এবং সেই কারণে আন্তর্জাতিক উত্তেজনাও চরমে উঠেছিল। বান্দুং সম্মেলন এই পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে বিশ্বের নিরাপত্তাবোধকে বাড়িয়ে তুলবার জন্যে, সাধারণ নিরস্ত্রীকরণের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে অস্ত্রহ্রাসের জন্যে এবং কার্যকরী আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণের অধীনে পারমাণবিক অস্ত্র নষ্ট করে ফেলার জন্যে আহ্বান জানায়। এইভাবে এশীয় এবং আফ্রিকীয় জাতিরা এই বিশ্বের আন্তর্জাতিক সমস্যাটির ব্যাপারেও তাদের অবস্থানকে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছিল এবং পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে, এই সমস্যা-সমাধানের ব্যাপারে নিজেদের জড়িত না করার কোন ইচ্ছা তাদের নেই।

বান্দুং সম্মেলন আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সমস্যাসমূহের প্রতি উদার, গঠনমূলক এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মনোভাব ব্যক্ত করেছিল এবং এই সহযোগিতাকে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান, বন্ধুত্ব এবং সৎপ্রতিবেশীসুলভতার ভাবধারায় অভিষিক্ত করতে চেষ্টা করেছিল। সম্মেলনে পারস্পরিক স্বার্থ এবং জাতীয় সার্বভৌমত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক সহযোগিতার ওপর জোর দেয়া

২ লিও মেইটস—জোটনিরপেক্ষতার তত্ত্ব ও সাম্প্রতিক নীতি, বেলগ্রেড, ১৯৭২ পৃঃ ৩৭১ ৩৮১

হয়েছিল। এ সুপারিশও করা হয়েছিল যে, বিশ্বের পণ্যমূল্যে এবং কাঁচামালের চাহিদায় স্থিরতা আনার জন্যে যৌথভাবে পদক্ষেপ করা হবে এবং আন্তর্জাতিক আলোচনামঞ্চে এই ধরনের সমস্যাগুলির প্রতি একটা সাধারণভাবে প্রযোজ্য দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা হবে। পরবর্তীকালে ১৯৭০'এর দশকে এই সুপারিশটি বৈদেশিক বাণিজ্যে সাম্রাজ্যবাদী হুকুমজারীর বিরুদ্ধে নতুন স্বাধীন জাতিসমূহের সংগ্রামের অন্যতম মূল ধারা হয়ে দাঁড়ায়।

আরও বলা যেতে পারে যে, বান্দুং সম্মেলন এশীয় এবং আফ্রিকীয় দেশসমূহের মধ্যে সাংস্কৃতিক সংযোগের বিশেষ তাৎপর্যকে চিহ্নিত করেছিল এবং এই সময়েই বিস্তৃততর বিশ্বব্যাপী সাংস্কৃতিক সহযোগিতার গুরুত্বের ওপর জোর দিয়ে এই সহযোগিতার ক্ষেত্রে সমস্ত রকমের বৈষম্য অপসারণের জন্যে ডাক দিয়েছিল।

বান্দুং সম্মেলনের সমাপনী ইশতেহারে সামাজিক প্রগ[illegible] প্রতি এশীয় এবং আফ্রিকীয় জাতিসমূহের দৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রে এক[illegible]া মৌলিক নতুনত্ব এনে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, সমস্ত জাতিই জা[illegible]তসংঘের সনদের ধারা অনুযায়ী নিজের নিজের রাজনৈতিক ও অর্থনৈ[illegible]তিক ব্যবস্থা বেছে নেবার এবং নিজেদের ধারায় জীবন গড়ে তুলবার অধিকার স্বাধীনভাবে খাটাতে পারবে। বস্তুত, সদ্য স্বাধীন জাতিসমূহের ওপর সাম্রাজ্যবাদ তার মনের মতো সামাজিক ব্যবস্থা চাপিয়ে দেবার জন্যে যে "দাবী" করে আসছে, বান্দুং সম্মেলন তাকে নাকচ করে দিয়েছিল। পরবর্তী বছরগুলিতে যখন ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে পড়েছে, তখন সমাজতন্ত্র-অভিমুখী জাতির সংখ্যা বিশ্ব-পটভূমিতে বেড়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদের দাবীকে নাকচ করে দেবার উপরোক্ত নির্দেশ বাস্তব রূপ পরিগ্রহণ করেছে।

পরিশেষে উল্লেখ্য যে, বান্দুং সম্মেলনের ইশতেহারে শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের নীতিগুলির তথা পঞ্চশীলের বিস্তারিত সংজ্ঞা দেয়া হয়েছিল। সেই সময়-নাগাদ এই নীতিগুলি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও পেয়েছিল।

বান্দুং সম্মেলনের সাফল্যগুলির একটি সংক্ষিপ্ত সার হিসেবে সবশেষে বলা যায়, নানান মতের সমাবেশে অনিবার্যভাবেই আপোষপন্থীদের উপস্থিতির দরুন এবং কমিউনিজমের প্রতি বিরোধিতায় উঠে পড়ে লাগা প্রতিক্রিয়াশীল চক্রগুলির প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির ফলে একটা প্রতিকূল পরিস্থিতির

উদ্ভব হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই সিদ্ধান্তে আমরা আসতে পারি যে, ঔপনিবেশিকতার নিগড় থেকে যেসব দেশ মুক্তি পেয়েছিল, তাদের তরফ থেকে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে স্বাধীন উন্নয়নের দিকে একটা মৌলিক অভিমুখিনতার পক্ষে সম্মেলনে শেষ পর্যন্ত বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু এটা অবশ্য ছিল একটা ইচ্ছার প্রকাশ মাত্র এবং এই ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করার ব্যাপারটা ছিল সামনেকার করণীয় কাজ। সামনে ছিল এই স্বাধীন উন্নয়নের অভিমুখিনতাকে ফলবতী করার জন্যে কঠিন লড়াই। দুঃখের বিষয়, এশিয়া এবং আফ্রিকার সমস্ত সরকার এবং এদের মধ্যে থেকে যারা বান্দুং সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন তাদের সকলে পরবর্তী বছরগুলিতে সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলির মর্মবস্তুর সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করতে পারেন নি। দেখা গিয়েছে যে, স্নায়ুযুদ্ধ এবং সাম্রাজ্যবাদের উদ্যোগে স্থাপিত সামরিক-রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার বাধ্যবাধকতা বেশ কয়েকটি দেশের কাছে প্রকৃত সার্বভৌমত্ব কিংবা আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীতে স্বাধীন ভূমিকার আকাঙ্খার চেয়েও বেশি জোরদার। বান্দুং সম্মেলনের আওতাতেই এর অব্যবহিত পরে আবার একটি আফ্রো এশীয় সম্মেলন আহ্বান করার জন্যে যে ইচ্ছা ব্যক্ত করা হয়েছিল, সেটি পূর্ণ না হওয়ার ব্যাপারটাকে উপরোক্ত পরিস্থিতি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়।

অবশ্য, বান্দুং সম্মেলনের আওতাতেই আরেকটি সম্মেলন আহূত না হওয়া সত্ত্বেও এর মৌলিক অভিমুখিনতার ধারা ক্রমাগত শক্তিশালী হতে থাকে। এই সময়ে ঔপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদকে বিপন্ন করে বিশ্বে যে শক্তির ভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটে, সেটাই স্বাধীন উন্নয়নের অভিমুখিনতাকে শক্তি যোগায়। বিশ্বের শক্তির ভারসাম্যের পরিবর্তনের সাক্ষ্য পাওয়া যায় সমাজতান্ত্রিক শিবিরের শক্তিবৃদ্ধিতে এবং বিশেষ করে ১৯৬০'এর দশকে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যগুলোর পতনের নাটকীয় দ্রুতগতির মধ্যে। ঔপনিবেশবাদের পতন এবং বিশ-ত্রিশটি দেশের স্বাধীনতা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের ব্যাপারটাও একটা গভীরতর সারসত্তা অর্জন করে। ফলে মুক্তিসংগ্রাম শুধু যে নির্দিষ্টভাবে বৃটিশ, ফরাসী এবং অন্যান্য ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে মোকাবেলা করে তা নয়। যে সাম্রাজ্যবাদ একটা ব্যবস্থা হিসেবে স্বাধীন দেশগুলিকেও প্রধানত অর্থনৈতিকভাবে নিপীড়ন করে চলেছে এবং তাদের

নয়া ঔপনিবেশিকতাবাদী নির্ভরতার জোয়ালে আটকাবার চেষ্টা করে আসছে, তার বিরুদ্ধেও জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম নিয়োজিত হয়।

ইতিমধ্যে, একথাটা কাচের মতো স্বচ্ছ ও পরিষ্কার হয়ে উঠছিল যে, জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের সাফল্যের পথে বেশি বেশি করে প্রতিবন্ধক হিসেবে এসে দাঁড়াচ্ছিল আন্তর্জাতিক উত্তেজনা, স্নায়ুযুদ্ধ। সাম্রাজ্যবাদ এবং বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যে সামরিক গোষ্ঠীর জাল বুনতে শুরু করে এবং তাতে এশিয়াকেও জড়ায়, সেটা ছিল এই স্নায়ুযুদ্ধের অন্যতম প্রধান ইন্ধন। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে বর্শাফলকের মতো উদ্যত করে সিয়াটো এবং সেন্টোর (আগে ছিল বাগদাদ চুক্তি) মতো যুদ্ধ-গোষ্ঠীগুলোকে সাম্রাজ্যবাদ বেশি বেশি করে ব্যবহার করতে শুরু করে এশিয়াতে নয়া ঔপনিবেশিকতাবাদী উদ্দেশ্য হাসিলের আশায়। এই পরিস্থিতিতে ১৯৬১ সালের সেপ্টেম্বরে বেলগ্রেড সম্মেলনে সংগঠনগতভাবে জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনের জন্ম হয়। এই বেলগ্রেড সম্মেলন চমকপ্রদভাবে বান্দুং সম্মেলনে ঘোষিত চিন্তাধারার প্রয়োগ-যোগ্যতাকে তুলে ধরে এবং কার্যত নতুন পরিস্থিতিতে বান্দুং 'এর কাছ থেকে নেতৃত্বের ভার কাঁধে তুলে নেয়।(৩) বান্দুং'এ যে নীতিগুলিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল, সেগুলি জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের কার্যক্রমের ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়। বান্দুং'এ ঘোষিত নীতিগুলির সঙ্গে এই আন্দোলন আরেকটি নীতিকে যুক্ত করে। সেটি হচ্ছে যুদ্ধ-গোষ্ঠীর সঙ্গে জড়িত না হবার নীতি। এই আন্দোলন তার অন্যতম প্রধান করণীয় হিসেবে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে সাহায্য করাকে নির্দিষ্ট রূপদান করে।

এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে, যিনি জোটনিরপেক্ষতার চিন্তাকে সামনে এনেছিলেন এবং সংজ্ঞা দিয়েছিলেন তিনি ভারতের অনন্যসাধারণ রাষ্ট্রনীতিবিদ ও প্রথম প্রধানমন্ত্রী জবাহরলাল নেহরু। দেশপ্রেমিক ও গণতন্ত্রবাদী নেহরু দেখতে পেয়েছিলেন যে, বিশ্ব-প্রেক্ষাপটে স্বাধীন অবস্থান নেবার ওপরেই

৩ প্রতিষ্ঠাকালের মুহূর্তে জোটনিরপেক্ষতার আন্দোলন শুধুমাত্র এশীয় এবং আফ্রিকীয় দেশগুলিকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল। ব্যতিক্রম ছিল ল্যাটিন আমেরিকার সমাজতন্ত্রী কিউবা এবং পূর্ব ইউরোপের যুগোস্লাভিয়া। ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বরে এই মহাদেশের বিভিন্ন দেশ এই আন্দোলনে যোগ দেয়।

প্রধানত সদ্যস্বাধীন দেশগুলির ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে। ইতিপূর্বে ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বরেও স্বাধীন ভারতের ভবিষ্যৎ বৈদেশিক নীতি সম্বন্ধে চিন্তা করে নেহরু দিল্লী বেতারে ভারতের স্বার্থের ভিত্তিতে সমস্ত আন্তর্জাতিক সমস্যার প্রতি মনোভাব নির্ধারণের ইচ্ছাটি ব্যক্ত করেছিলেন। এই ইচ্ছাটি ছিল, বিশ্বে "পরস্পরের বিরুদ্ধে নিয়োজিত বিভিন্ন গোষ্ঠীর রাজনীতি থেকে দূরে থাকা।"(৪) তখন পরিস্থিতি ছিল এই যে, সাম্রাজ্যবাদীরা সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের বিরুদ্ধে স্নায়ুযুদ্ধে ইন্ধন জোগাচ্ছিল। যে জন ফস্টার ডালেসের নাম অজানা নয়, সে ঘোষণা করেছিল, "যারা আমাদের পক্ষে নয় তারা আমাদের বিপক্ষে।" এই অবস্থায় নেহরুর সূত্রায়িত নীতির মধ্যে ছিল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মর্মবস্তু। একথাটা সহজেই অনুধাবনযোগ্য। স্বাভাবিক-ভাবেই ডালেস ক্রোধে ফেটে পড়েছিল। সে নেহরুর নীতিকে "অসৎ" বলে অভিহিত করেছিল।

নেহরু পরবর্তীকালে বিভিন্ন উপলক্ষ্যে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছিলেন যে, "আমরা কোন গ্রুপে আমাদের জড়াবো না" বলে ভারত যে নীতি নিয়েছে, তার সঙ্গে পক্ষপাতশূন্যতা, নিষ্ক্রিয়তা অথবা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতার কোন সহমর্মিতা নেই। অর্থাৎ ভারত যে নীতি নিয়েছে সেটা "বেস্টনীর পাশে অবস্থান নেয়ার" ব্যাপার নয়।(৫) ব্যাপারটা বরং বিপরীত। নেহরু দেখছিলেন যে, জোটনিরপেক্ষতা ভারতকে বিশ্বে সক্রিয় এবং স্বাধীন নীতি নিয়ে অগ্রসর হবার সম্ভাবনা জোগাবে। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, ভারত সমতার শর্তাবলীর ভিত্তিতে সমস্ত দেশের সঙ্গে সহযোগিতা করতে তৈরী রয়েছে এবং এরই ধারায় ভারত সেইসব দেশকেই সমর্থন দেবে যারা বিশেষ বিশেষ প্রশ্নে ভারতের স্বার্থের সঙ্গে সামুজ্যের অবস্থান নেবে।

দক্ষিণপূর্ব এবং দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়াতে সামরিক গোষ্ঠী হিসেবে ম্যানিলা ও বাগদাদ চুক্তির অবতারণা ঘটলে নেহরু জোটনিরপেক্ষতার নীতির মর্মবস্তুকে আরও বেশি নির্দিষ্ট করেছিলেন। ভারতীয় পার্লামেন্টে উপরোক্ত ঘটনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে নেহরু বলেছিলেন, "আমরা মনে করি, (এই

৪ জবাহরলাল নেহরু, ভারতের বৈদেশিক নীতি, দিল্লী ১৯৬১ পৃঃ ২

৫ ঐ পৃঃ ৬৭-৬৮

ব্যবস্থাগুলো) এরা বিশ্বকে ভুল পথে ঠেলে দিচ্ছে। যেসব উপাদান শান্তি, নিরস্ত্রীকরণ ও উত্তেজনা-হ্রাসের দিকে বিশ্বকে নিয়ে যেতে পারে, সেগুলিকে না খাটিয়ে উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলো ইচ্ছাকৃতভাবে এদের প্রতিহতই করছে এবং এমন সব প্রবণতাকে উস্কে দিচ্ছে যেগুলো ঘৃণা, ভীতি ও যুদ্ধাশঙ্কাকে ঘনিয়ে তোলে এবং নিরস্ত্রীকরণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।"* নেহরু বলেছিলেন যে, সিয়াটোতে যোগ দেয়া তো দূরের কথা, যদি ভারত দর্শক হিসেবেও ম্যানিলা সম্মেলনে যোগ দিতো, তাহলে সেটার অর্থ হতো আমাদের মৌলিক জোটনিরপেক্ষতার নীতিকে জলাঞ্জলি দেয়া।"**

এইভাবে যখন আমরা জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের ধ্যানধারণাকে তার নেতিনেতির দিক থেকে জন্মাতে দেখি, অর্থাৎ যখন বৃহত্তর শক্তিগুলির দ্বারা গঠিত ব্লক বা সমাবেশের সঙ্গে না জড়ানোর ব্যাপার দ্বারা তার পরিমাপ করতে যাই, তখন আমরা দেখতে পাই যে, যেসব জাতি সবেমাত্র সেই সময়ে ঔপনিবেশিক শাসনের কব্জা থেকে বেরিয়ে এসেছে তাদের সামনে বস্তুতপক্ষে বিকল্প কোন বিশেষ ব্লক বা সমাবেশ গঠনের প্রশ্ন ছিল না। ল্যাটিন আমেরিকার তো কোন কথাই নেই. এশিয়া কিংবা আফ্রিকাতেও সোভিয়েত ইউনিয়নের তরফ থেকে কোন সামরিক জোট গড়া হয়নি, আজও তা নেই। এশিয়া এবং আফ্রিকাতে শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে খাড়া করা হয়েছিল সামরিক জোট—সিয়াটো এবং বাগদাদ চুক্তি। তখন আমাদের দুই মহাদেশের সদ্য স্বাধীন জাতিসমূহের সামনে একটাই ঐচ্ছিক ব্যাপার ছিল। সেটা হলো, উপরোক্ত দুটো জোটে যোগ দেয়া, অথবা এদের বাইরে থাকা। এই বাইরে থাকার প্রক্রিয়াটা জোট-নিরপেক্ষতার নামে পরিচিত হয়।

প্রধানত সদ্যস্বাধীন এশীয় এবং আফ্রিকীয় জাতিসমূহের দ্বারা গঠিত জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন যখন দৃঢ়ভাবে সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, নয়া ঔপনিবেশিকতাবাদ ও বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে এবং শান্তি ও শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের পক্ষে পদক্ষেপ করলো, তখন সাম্রাজ্যবাদও জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনকে বিপদ হিসেবে চিহ্নিত করলো এবং এটা কাউকে বিস্মিতও

* ঐ পৃঃ ৯৫
** ঐ পৃঃ ৮৭

করলো না। শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থানের অন্যতম নীতি হলো, "আত্মনিয়ন্ত্রণ, স্বাধীনতা, এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের পথকে স্বাধীনভাবে বেছে নেবার ব্যাপারে সমস্ত জাতির অধিকার রয়েছে।"* জোট নিরপেক্ষতার এই অন্তর্নিহিত মর্মবস্তু সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তিসমূহের গণতান্ত্রিক অবস্থানের অভিধা হিসেবে সাম্রাজ্যবাদের হিংস্র আক্রমণের লক্ষ্য রয়েছে এখনও। অবশ্য ইদানীং কালের চক্রের আবর্তনের দরুণ সাম্রাজ্যবাদকে "মুখে" এই আন্দোলনের উৎসাহী প্রবক্তারূপেও দেখা যাচ্ছে।

সম্প্রতি জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীলদের ষড়যন্ত্র খাড়াখাড়িভাবে বেড়ে গিয়েছে। এর প্রধান কারণ, বিশ্বের এই আন্দোলনের ভূমিকা ও প্রভাব প্রসারিত হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদীরা শুধু যে বিশেষ করে তাদের রাজনৈতিক নয়া ঔপনিবেশিকতাবাদের দেউলিয়াত্ব এবং সামরিক জোট ও সাম্রাজ্যবাদের পরিপোষক সরকারগুলির বিপর্যস্ত অবস্থার দরুণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে উঠেছে তাই নয়। সাম্রাজ্যবাদীরা দেখছে যে তাদের নয়া ঔপনিবেশিকতাবাদী অর্থনৈতিক পদ্ধতিগুলোও ফলপ্রসূ হচ্ছে না। এশিয়া, আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার দেশসমূহে স্বাধীন অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রবণতা অব্যাহতভাবে বাড়ছে। এইসব দেশ আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের ব্যবস্থাতে তাদের অমর্যাদা বা অসম অবস্থানের অবসান করার জন্যে আগের চেয়ে অনেক বেশি সংকল্পবদ্ধ, কারণ সাম্রাজ্যবাদই এই অসম অর্থনৈতিক সম্পর্কের ব্যবস্থাকে গড়ে তুলেছে এবং একে রক্ষা করছে। স্বাধীন দেশসমূহের স্বাধীনতার এই একরোখামির চমকপ্রদ উদাহরণ হচ্ছে ১৯৬০'এর দশকের শেষের দিকে ৭৭টি দেশের গ্রুপ'এর অভ্যুদয়। এই সংস্থায় বর্তমানে রাষ্ট্রসংঘের ১২০টি উন্নয়নশীল রাষ্ট্র সদস্য হয়েছে। বিপ্লবী কিউবার নেতা ফিদেল ক্যাস্ট্রো মন্তব্য করেছেন: "যদি জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনকে উপনিবেশবাদ ও নয়া ঔপনিবেশিকতাবাদের ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার এবং পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের প্রয়াসী দেশগুলির রাজনৈতিক চেতনার প্রতিভূ বলা যায়, তাহলে '৭৭টি দেশের গ্রুপ' উদ্ভূত হয়েছে অর্থনৈতিক চেতনার প্রতিভূ হিসেবে।"**

---

* ডকুমেন্ট্স্ ডেস কনফারেন্সেস এট রিইউনিয়নস ডেস পেস্ নন এলিয়ানেস, ১৯৬১-১৯৭৮ বেলগ্রেড, ১৯৭৮ পৃঃ ৬।

** গ্রানমা, ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৭৯।

জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনে যে উন্নয়নশীল দেশেরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে তাদের যৌথ এবং মূলত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কাজকর্মগুলো সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির দৃঢ় সমর্থন পাচ্ছে। এই ঘটনায় সাম্রাজ্যবাদ তার পরিকল্পনা ও অবস্থানকে বিপন্ন মনে করছে। জোটনিরপেক্ষ এবং সমাজতান্ত্রিক শিবিরের দেশেরা উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুক্তভাবে পদক্ষেপ করছে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো বিভিন্ন মৌলিক বিষয়ে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়েছে। এই মৌলিক বিষয়গুলি হচ্ছে জাতীয় মুক্তির শক্তিসমূহের প্রতি সংহতি, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্কসমূহের কাঠামোর পুনর্গঠন, সাম্রাজ্যবাদী হুকুমনামা ও আগ্রাসনের এবং বর্ণবৈষম্য ও বর্ণপৃথকীকরণের বিরোধিতা প্রভৃতি। এই প্রসঙ্গে আরও বলা যায়, বিশ্ব-সমাজতন্ত্রের শক্তি বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পৃথিবীতে যে ইতিবাচক পরিবর্তনগুলো ঘটছে, তার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েও জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন নব নব শক্তি অর্জন করছে। এশিয়া এবং আফ্রিকার স্বাধীন জাতিসমূহের উদ্ভবের ক্ষেত্রেও বিশ্বসমাজতন্ত্র যে ভূমিকা নিয়েছে সেটাকে একেবারে সামান্য বলা যায় না। এই দেশগুলোও বিশ্বসমাজতন্ত্রের সঙ্গে নিজেদের ভবিষ্যৎকে যুক্ত করেছে। জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত যেসব দেশ ঔপনিবেশিক শাসনের শৃঙ্খল ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সমাজতন্ত্রের পথ নিয়েছে, তারা জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনে বড় রকমের অবদান রাখছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, একত্রিত ভিয়েতনামের কথা বলা যায়।

নতুন স্বাধীন দেশগুলো আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে তাদের নতুন, কর্তৃত্ব-ব্যঞ্জক ও মর্যাদাসম্পন্ন ভূমিকা নিয়ে দাঁড়ানোর ফলে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো এদের সম্মুখে নতুন কৌশল অবলম্বন করতে বাধ্য হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো ১৯৫০'এর দশকের মতো আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নতুন স্বাধীন দেশগুলোর স্বাধীন ভূমিকাকে পুরোপুরি অস্বীকার করে ঠেলে ফেলে দিতে পারছে না। এই কৌশলগুলো কখনো কখনো নমনীয় হলেও জাতীয় মুক্তি ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার পক্ষে কম অশুভ নয়। এই কৌশলগুলো প্রয়োগ করা হচ্ছে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের সঙ্গে আপেক্ষিকভাবে পাল্লা দিয়ে।

জোটনিরপেক্ষতার প্রতি সম্প্রতি সাম্রাজ্যবাদের মনোভাবের মধ্যে

অন্তর্নিহিতভাবে যে পরিবর্তনগুলো ঘটেছে, সেগুলোকে বর্তমান মার্কিন প্রশাসনের নীতিতে স্পষ্ট ভাবেই প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। এই নীতি জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের নানা উপাদানে গড়া চরিত্রকে কাজে লাগাতে চাইছে। জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের মধ্যে একদল প্রগতিবাদী দেশ রয়েছে যারা আনুপূর্বিকভাবে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী অবস্থান নিয়ে চলেছে। বিভিন্ন দেশ নিয়ে একটা মধ্যপন্থী গ্রুপও রয়েছে, যার অন্তর্ভুক্ত দেশেরা প্রগতিবাদী-দের সঙ্গে বহু মৌলিক প্রশ্নে সহযোগিতা করছে। এই মধ্যপন্থীরা অবশ্য সব সময়ে তাদের কাজে সামঞ্জস্য বজায় রাখে না। এছাড়া জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের একটা পক্ষ রয়েছে যারা রক্ষণশীল। এই সর্বশেষোক্ত ধরনের দেশগুলো সাম্রাজ্যবাদী প্রচারের উস্কানির পাল্লায় পড়ে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েই থাকে। সাম্রাজ্যবাদী প্রচার অহরহ বলছে যে, জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের বিপদ হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো এবং বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন। প্রধান প্রধান আন্তর্জাতিক প্রশ্নে যখনই যে কোন জায়গায় জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের অবস্থান এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের অবস্থান বস্তুগতভাবে মিলে যায়, তখনই সাম্রাজ্যবাদের প্রচারকরা শোরগোল করে বলে যে, এটা হচ্ছে জোটনিরপেক্ষতা থেকে পিছু হটে যাওয়া।

বস্তুতপক্ষে সাম্রাজ্যবাদী প্রচার এখন আর জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের সোজাসুজি সমালোচনা করছে না। বরং জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনকে সাম্রাজ্যবাদীরা "সিধে এবং সরল" করার কথা বলছে এবং বিশেষ করে বলছে যে, এই আন্দোলন "সত্যিকার" নিরপেক্ষ হোক এবং বলছে যে, এই আন্দোলন তার "গোড়াকার নীতিগুলোকে অনুসরণ করুক।" ১৯৭৯ সালের সেপ্টেম্বরে হাভানাতে জোটনিরপেক্ষ দেশসমূহের যে ষষ্ঠ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তাকে ঘিরে সাম্রাজ্যবাদীদের চেঁচামিচিতে একটা আন্দাজ পাওয়া গিয়েছে সমালোচনার ধারাবদলের। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, বৃটিশ বৃহৎ পুঁজিপতি চক্রের মুখপত্র **"ফিনান্সিয়াল টাইমস"** উপরোক্ত সম্মেলনের ফলাফলকে নিম্নলিখিতভাবে বিশ্লেষণ করেছে, যথা : "সম্মেলনের অধিকাংশ যোগদানকারীর মনে হয়েছে যেন কিউবা আন্দোলনটাকে সোভিয়েত ইউনিয়নের পঞ্চমবাহিনী করে তুলতে চায়। এই পরিস্থিতিতে অধিকাংশ সদস্য রাষ্ট্র আন্দোলনের একেবারে গোড়াকার সমস্ত নীতিকে

শক্তিশালী করার এবং নতুন করে ঝালিয়ে নেবার জন্যে জেদ করেছে। এই নীতিগুলির মধ্যে রয়েছে দুই শক্তি-জোট থেকেই দূরে থাকা এবং কোন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা।"* জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের নতুন সংযোগরক্ষাকারী কিউবার দুর্নাম করার সঙ্গে সঙ্গে বুর্জোয়া প্রচারণা বিশেষভাবে উদ্যোগ নিয়ে জনগণকে একথাটা বোঝাবার চেষ্টা করছে যে, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন গঠিত হয়েছিল "দুই বৃহৎ শক্তির তথা সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপকে" একতাবদ্ধ হয়ে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে। বুর্জোয়া প্রচারণা একথাও বোঝাবার চেষ্টা করছে যে, এই দুই বৃহৎ শক্তি থেকে সমদূরত্বে থাকাটাই জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের অস্তিত্বের শর্তস্বরূপ। দুঃখের সঙ্গে বলতে হবে যে, কোন কোন জোটনিরপেক্ষতাবাদী দেশে এমন সব প্রচার-মাধ্যম ও রাষ্ট্রনীতিবিদের অস্তিত্ব রয়েছে যারা এই প্রচারণাকে টিয়া পাখীর মতো আওড়ায়।**

বস্তুতপক্ষে, এখানে আমি এটা দেখাতেও চেষ্টা করেছি যে, একেবারে শুরু থেকেই জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের চিন্তায়—"সারা বিশ্বে আস্থা এবং শান্তিকে দৃঢ়তর করে তুলবার কাজে যে সরকার কিছু অবদান রাখবে তার সঙ্গেই সহযোগিতা করার" ইচ্ছার ব্যাপারটাকে প্রাথমিক উপাদান বলে মেনে নেয়া হয়েছিল।*** বেলগ্রেড সম্মেলনের ঘোষণাপত্রে এই ইচ্ছাই অতঃপর নথীভুক্ত হয়েছে। জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির এটা কোন দোষ হতে পারে না যে, এই ধরনের বিষয়ে তাদের প্রধানত সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অন্তর্ভুক্ত সরকারগুলির সঙ্গেই সহযোগিতা করে কাজ করতে হয়। জোটনিরপেক্ষ দেশগুলি যে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সরকারসমূহের সঙ্গে মিলিত হয়ে সাম্রাজ্যবাদ,

---

* ফিনান্সিয়াল টাইম্‌স্, ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯

** সাম্রাজ্যবাদী প্রচারণার কাছে আত্মসমর্পণের একটি সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত হচ্ছে "এসিয়ান" গ্রুপের প্রধানমন্ত্রীদের অবস্থান। কুয়ালালামপুরে ই ই সির প্রধানমন্ত্রীদের সঙ্গে এক বৈঠকে 'এসিয়ান' প্রধানমন্ত্রীরা একটা যুক্ত বিবৃতিতে সই দিয়েছেন। এই যুক্ত বিবৃতিতে জোটনিরপেক্ষ দেশ আফগানিস্তান, কাম্পুচিয়া ও ভিয়েতনাম এবং এই সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে বিষোদগার করা হয়েছে।

*** ডকুমেন্ট ডেস ইত্যাদি, ১৯৬১-১৯৭৮ পৃঃ ৬

বৈদেশিক দখলদারি, প্রভুত্ব ও আধিপত্যের বিরুদ্ধে লড়ছে, এই জন্যেও তাদের দোষ দেয়া যায় না নিশ্চয়।

আমার মনে হয়, যেসব মধ্যপন্থী সরকার জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনে শরিক রয়েছেন শুধু তারাই নন, এই আন্দোলনের শরিক রক্ষণশীল সরকার-গুলিও একথাটা বুঝবেন যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের জালে যেকোনভাবে জড়ালে সেটা বিপদ ডেকে আনবে। জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন গুরুতররূপে দুর্বল হবে এবং সদস্যরাষ্ট্রসমূহের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার ক্ষমতা মার খাবে। বর্তমান পরিস্থিতিটা হলো এই যে, সাম্রাজ্যবাদ আবার নতুন স্বাধীন দেশগুলির বিরুদ্ধে আক্রমণ বাড়াচ্ছে এবং ঘোষণা করছে যে, এশিয়া এবং আফ্রিকার বড় বড় এলাকা যথা ভারত মহাসাগর ও পারস্য উপসাগর সাম্রাজ্যবাদের "বিশেষ জরুরী স্বার্থের" এলাকা। সাম্রাজ্যবাদ সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে এইসব তথাকথিত স্বার্থ রক্ষার ইচ্ছাও জানাচ্ছে।

এখানে একথাটাও বলে রাখা যেতে পারে যে, জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনকে আক্রমণ করার অছিলা হিসেবে "সমদূরত্বের তত্ত্ব"কেও আক্রমণ করা হচ্ছে। এই আক্রমণটা আসছে বিপরীত দিক থেকে। আক্রমণকারীরা হচ্ছে তথাকথিত "বামমার্গী"রা এবং এদের মধ্যে এমন সব ব্যক্তিও রয়েছে যারা শ্রমজীবী জনগণ এবং শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষ থেকে কথা বলার দাবীদার। এই তথাকথিত "বামপন্থী"দের "বাঁধা গৎ" হচ্ছে এই যে, জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনটাই একটা নোংরা ব্যাপার এবং এটা দুটো বিরোধী শিবিরের মাঝখানে খেলা করা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই বক্তব্য থেকে তাদের সিদ্ধান্ত হলো, যে সব সরকার প্রগতিবাদী আভ্যন্তরীণ নীতি নিয়ে চলছে, তারাও জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করে "সামাজিক প্রগতির" আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে এবং বুর্জোয়াদের হাতে খেলছে।

ভারতের কমিউনিস্টরা এই "অবস্থান"কে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তার মৌল বৈদেশিক নীতি সংক্রান্ত দলিলে স্বার্থহীনভাবে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রতি তার সমর্থন জানিয়েছে। এই প্রসঙ্গে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি বলেছে যে, জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের

সদস্য জাতিগুলির সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলির মধ্যে পার্থক্য যাই থাকুক না কেন, সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী নীতির বিরুদ্ধে এবং জাতীয় স্বাধীনতা ও শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থানের পক্ষে এই আন্দোলনের কার্যক্রম ও সংগ্রাম হচ্ছে উন্নয়নশীল দেশসমূহের অধিকাংশ শ্রেণী ও সামাজিক স্তরের গণতান্ত্রিক স্বার্থগুলির অভিব্যক্তি। এইভাবেই জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের কার্যক্রম ও সংগ্রাম শ্রমিকশ্রেণীর এবং সমস্ত শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থের সঠিক উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

আমাদের মতে জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনের এই আত্মপ্রকাশ বিশ্ব-জুড়ে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে সমাজতন্ত্রে পৌঁছবার অন্তর্বর্তীকালের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সবচেয়ে বড় প্রতীকগুলোর অন্যতম হয়ে দাঁড়িয়েছে। শক্তির ভারসাম্যের বিশ্বজোড়া পরিবর্তন হচ্ছে আমাদের যুগ-চরিত্রের চিহ্ন। ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক নির্ভরতাকে যেসব জাতি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে, তাদের স্বাধীন ভূমিকা পালনের দাবী এই আন্দোলনের উত্থান ও সংহতিসাধনের মধ্য দিয়ে জোরদার হয়েছে এবং এই পথটাকে তৈরী করে দিয়েছে শক্তির ভারসাম্যের পরিবর্তন। আমরা এই ব্যাপারটাকে লেনিনের দূরদৃষ্টির বাস্তবায়ন বলে মনে করি। প্রায় ৬০ বছর আগে আমাদের যুগের প্রারম্ভে লেনিন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, প্রাচ্যের জাতিগুলো মুক্তি অর্জন করতে পারলে, এই ধরনের যে সব জাতি পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও সাম্রাজ্যবাদের সংরক্ষিত ভাণ্ডার হয়ে দাঁড়িয়েছিল তারা বিশ্বের ভাগ্য নির্ধারণে শরিক হবে। (কালেক্টেড ওয়ার্কস, ৩০ খণ্ড পৃঃ ১৫৯-১৬০)

আজ তারা সেই অধিকারটাকেই নতুন করে তুলে ধরছে। তারা কতক-গুলো নীতি থেকে শক্তি সংগ্রহ করছে। জোট-নিরপেক্ষ দেশসমূহের হাভানা সম্মেলনে ফিদেল ক্যাস্ট্রোর আবেগময় ভাষণে এই নীতিগুলো নতুন ধরনের জোরালো ভাষা পেয়েছে: "আমরা দৃঢ় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, নয়া-উপনিবেশবাদ-বিরোধী, বর্ণবৈষম্য-বিরোধী, উগ্র ইহুদীবাদ-বিরোধী এবং ফ্যাসিবাদ-বিরোধী। এর কারণ হলো এই যে, আমাদের এই সমস্ত অবস্থানের নীতি আমাদের ভাবনা-চিন্তার অঙ্গস্বরূপ। আমাদের নীতিগুলো জোটনিরপেক্ষ দেশসমূহের আন্দোলনের মর্মবস্তু এবং মূল ধারা। যখন থেকে এই আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা, তখন থেকেই আমাদের নীতিগুলো আন্দোলনের

জীবন ও ইতিহাসের উপাদান হিসেবে কাজ করে আসছে। এখানে আমরা যেসব জাতির প্রতিনিধিত্ব করছি, তাদের জীবন ও ইতিহাসে আমাদের নীতিগুলো তরতাজা অবস্থায় রয়েছে।"*

সুতরাং সাম্রাজ্যবাদের প্ররোচনার রসুইখানায় যেসব "নীতি"কে মিথ্যের মসলা দিয়ে বানানো হয়, সেগুলো যত ক্ষতিই করুক না কেন, শেষ পর্যন্ত সেগুলো ভেস্তে যেতে বাধ্য। সাম্রাজ্যবাদ চেষ্টা করছে যে তার বানানো নীতি দিয়ে সে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর মধ্যে একটা গোঁজ ঢুকিয়ে দিতে পারবে, জোটনিরপেক্ষ দেশগুলোর অন্তর্ভুক্ত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোকে হেনস্থা করবে, আন্দোলনকে টুকরো টুকরো করে দেবে এবং বিশ্বের প্রেক্ষাপটে এই আন্দোলনের মর্যাদা ও প্রভাবকে বিনষ্ট করে দেবে। এ চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। কারণ, জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের নীতিগুলো আন্দোলনের অঙ্গীভূত ব্যাপার।

সাম্রাজ্যবাদের প্রচেষ্টাগুলো অবশ্য শুধু প্রচার এবং আন্তর্জাতিক শলাপরামর্শে সীমিত নয়। এদের পিছনে রয়েছে সাম্রাজ্যবাদী ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের দুর্দান্ত বাস্তবতা। কোনো কোনো দেশে সাম্রাজ্যবাদীরা চেষ্টা করছে সাম্রাজ্যবাদের অনুকূল নীতি চাপিয়ে দিতে। আবার কোথাও বা তারা চেষ্টা করছে সরাসরি আগ্রাসন করার। বর্তমান মার্কিন প্রশাসন ইরানের সম্পর্কে যে নীতি নিয়েছে, সেটা একটা দৃষ্টান্ত। মার্কিন প্রশাসন ইরানকে বাধ্য মিত্র হিসেবে এবং শাহের আমলের মতোই জোট-নিরপেক্ষতার ধ্যানধারণার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হিসেবে ফিরে পেতে চায়। তবে, ইরানের জনগণ যে পথ বেছে নিয়েছেন সেখান থেকে তারা আর ফিরতে পারেন না। ইরানের প্রজাতন্ত্র জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনে যোগ দিয়েছে।

আরেকটি দৃষ্টান্ত—পাকিস্তান। মাত্র এই সেদিন পাকিস্তান জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনে প্রবেশাধিকার পেয়েছে। কিন্তু একে আবার যুদ্ধ-জোটের রাজনীতিতে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। চেষ্টা চলছে সেই দিনগুলোকে ফিরিয়ে আনার, যখন পাকিস্তান সিয়াটো ও সেন্টোর সদস্য ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট এলাকায় পাকিস্তানকে তার ছাউনিতে

* গ্রানমা, সাপ্তাহিক পর্যালোচনা, ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯

পরিণত করতে চাইছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে, বিপ্লবী ও জোটনিরপেক্ষ আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে অঘোষিত যুদ্ধ চালাবার সঙ্গে সঙ্গে জোট-নিরপেক্ষ ভারতের স্বাধীনতাকে বিপন্ন করা।

সকলেই জানে, ইরানে শাহের অপসারণের পরে সি আই এ'র আঞ্চলিক সদর দপ্তর পাকিস্তানে স্থানান্তরিত হয়। মার্কিন পত্রিকা 'কাউন্টার স্পাই'এর সম্পাদক কনরাড ঈগল 'ঝুলি থেকে বিড়াল' বার করে দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন যে, সি আই এ'র একটা বিশেষ হানাদার গ্রুপকে পাকিস্তানে শিখিয়ে পড়িয়ে বসানো হয়েছে। এদের মাথায় রয়েছে পেশাদার গোয়েন্দা কর্মচারী রবার্ট পি লেসাড'। এক বছরেরও বেশ কয়েকদিন বেশি হলো ব্যাপারটা ঘটানো হয়েছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে ভাড়াটে আফগানদের প্রশিক্ষিত করা এবং তাদের ধ্বংসাত্মক কাজকে পরিচালিত করা। সি আই এর এই গ্রুপে রয়েছে জন জে, রেয়াগান, ডেভিড আর ধারমান ও রিচার্ড স্টি. জ্যাকসান। আফগান বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিকদের কয়েকজনও ভাড়াটে বাহিনীগুলোর পরিচালক। এটা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, পাকিস্তানের সামরিক সরকার দেশে সমস্ত রকমের রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করলেও আফগান প্রতিবিপ্লবী সংগঠনগুলো সেই নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়েনি। এই সংগঠনগুলোর চাঁইরা দিব্যি জমায়েত করে বেড়াচ্ছে, "একত্রীকরণের" কথা বলছে এবং আফগানিস্তানের ভিতরে ঢোকাবার জন্যে দস্যুদল তৈরী করছে।

গত কয়েক মাসে কতকগুলো বুর্জোয়া সংবাদপত্রেও পাকিস্তানের এলাকা থেকে আফগানিস্তানে অবিশ্রান্ত আগ্রাসন চালাবার বহু তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। এই সব ঘটনা থেকে আফগান বিপ্লবের নেতা বাব্রাক কার্মালের বক্তব্যের সারবত্তা প্রমাণিত হয়। তিনি বলেছেন যে, আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে আগ্রাসন হ্রাস পাওয়া দূরে থাকুক তাকে আরও বাড়িয়ে তোলা হচ্ছে।*

ইতিমধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার সর্বশেষ গতিপরিণতি থেকে বুঝতে পারা যায় যে, আমাদের দুই মহাদেশের দেশগুলোর স্বাধীন নীতি অবলম্বন এবং জোট-নিরপেক্ষতার নীতিকে শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার স্যাটোর

* ওয়ার্ল্ড মার্ক্সিস্ট রিভিউ—এপ্রিল, ১৯৮০

দোস্তেরাই ব্যাহত করছেনা। এই এলাকায় পিকিং যে আধিপত্যবাদী নীতি অনুসরণ করে চলেছে, তার ফলেও যুদ্ধের বিপদের হাওয়া উঠছে। পিকিং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদী আরবের সঙ্গে মিলে এবং এই সঙ্গে ইজিপ্ট ও ইসরায়েলকেও জুটিয়ে নিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীকে অস্ত্রে সজ্জিত করছে, আফগান প্রতিবিপ্লবীদের যথাসাধ্য সাহায্য দিচ্ছে এবং ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোতে নানারকমের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে সাহায্য জোগাচ্ছে। পিকিং এইভাবে ভারতের ঐক্যকে বিপন্ন করে তুলছে এবং দুই দেশের বর্তমান সীমান্তকে বদলাবার জন্যে সুদূর-প্রসারী মতলব আঁটছে।

ভারতের সংবাদপত্রসমূহের খবর এই যে, পিকিং'এর এইসব কাজ হচ্ছে আমাদের এই অঞ্চলে চীন-মার্কিন সহযোগিতার কটিকা-পরিকল্পনার অংশ। মার্কিন প্রতিরক্ষাসচিব হ্যারল্ড ব্রাউনের পিকিং সফরের সময় এই পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এই পরিকল্পনার একটি দফা হচ্ছে, উন্নতমানের মার্কিন সামরিক কারিগরি সাজসরঞ্জাম সরবরাহের বিনিময়ে পিকিং পাকিস্তানে সামরিক শিক্ষক পাঠাবে। তাদের কাজ হবে ভাড়াটে বাহিনী এবং ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত লোকজনকে প্রশিক্ষিত করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত করা।

ভারতের সংবাদপত্রসমূহে একথাও বলা হয়েছে যে, এই ব্যাপারগুলো ভারতের নিরাপত্তার প্রতি সরাসরি হুমকিস্বরূপ। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখানো হয়েছে, পাকিস্তান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের অংশে পুঞ্চ শহরের কাছে আলিয়াবাদ নামের খুদে পাহাড়ী গ্রামে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর কর্মাধ্যক্ষদের সরাসরি তত্ত্বাবধানে একটা বড় আকারের বিশেষ উদ্দেশ্যের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ চালানোর ঘাঁটি বসানো হয়েছে। ২৫০ জনের একটি অতিরিক্ত চীনা সামরিক শিক্ষকের দল সম্প্রতি সেখানে পৌঁছেছে। এরা ভাড়াটে-বাহিনী এবং ধ্বংসাত্মক কার্যে লিপ্ত লোকজনের প্রশিক্ষনের কাজে দেখা-শোনা করছে। এইসব লোকজনই আফগানিস্তান, ভারত এবং এই অঞ্চলের অন্যান্য দেশে গোপনে প্রবেশ করছে। এই নতুন ঘাঁটি থেকে ভারতের সীমান্ত পর্যন্ত সেনাচলাচলের রাস্তা নির্মাণ করা হচ্ছে। পি টি আই মনে করে, ভারতের জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের ওপর আঘাত হানার জন্যে এই এলাকাটাকে

উল্লম্ফন-ভূমি হিসেবে ব্যবহার করা হবে এবং উপরোক্ত ঘাঁটিটা হচ্ছে তার প্রথম পদক্ষেপ।

এই সেদিন মার্কিন প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা জবিগনিউ ব্রজেজিনস্কির পাকিস্তান সফরের ওপর বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে করাচীর সংবাদপত্র 'ডন' উপরোক্ত প্রক্রিয়ার ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল। এই সংবাদপত্রের ভাষ্য ছিল এই যে, পাকিস্তান সরকারের বর্তমান নীতি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পিকিং'এর মৈত্রী সম্পর্কের সঙ্গে তথা পিকিং'এর সঙ্গে লাইন দিয়ে দাঁড়ানোর ব্যাপারটা জোটনিরপেক্ষতার নীতি থেকে সরে দাঁড়ানোর উপক্রমণিকা।

এই সব কিছুই ভারতে উদ্বেগ সৃষ্টি করছে। ভারতের স্বাধীন বৈদেশিক নীতিতে সব সময়েই সাম্রাজ্যবাদীদের চোখ টাটিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদীরা বরাবরই জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ধারার ওপর রাগ ঝেড়েছে। একথা সত্য যে, সত্তরের দশকের মাঝখানে বিশেষ করে যখন তদানীন্তন জনতা পার্টি ক্ষমতায় আসে, তখন ভারতের শাসক মহলগুলো সাম্রাজ্যবাদীদের দিকে ঝুঁকেছিল। "সাচ্চা জোট-নিরপেক্ষতা"র ধুম্র-জালের আড়ালে ছিল ভারতের বৈদেশিক নীতির সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মর্মবস্তুকে তরল করে দেবার চেষ্টা। সাম্রাজ্যবাদীরা এই ব্যাপারটাকে খুব দ্রুতবেগে ঘটাচ্ছিল। তারা ভারতকে জোটনিরপেক্ষতা থেকে সরিয়ে নেবার জন্যে ভারতের ওপর প্রচণ্ড চাপ দিচ্ছিল।

যেভাবে এই ব্যাপারটা চালানো হচ্ছিল, সেটা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আজ আর এদের কেউ জন ফস্টার ডালেসের আমলের মতো ভারতের বিরুদ্ধে "অসৎ নীতির" অভিযোগ আনছেনা। বরঞ্চ, কার্টার-প্রশাসন "বৈদেশিক নীতিতে বহুলতা"র মহা-উৎসাহী প্রবক্তা হিসেবে নিজেকে উপস্থাপিত করছে এবং ভাণ করছে যে, উন্নয়নশীল দেশগুলোকে মূল্য দিয়েই তাদের অবস্থান ও নীতি-ধারাকে মার্কিন প্রশাসন সমর্থন করছে। কিন্তু এইসব মিষ্টি কথায় গোড়ার সূত্রগুলোর সারমর্মকে ব্যাখ্যা করে দেখাতে গিয়ে সাম্রাজ্যবাদী পত্রপত্রিকাগুলো রাখা ঢাকার মধ্যে থাকে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ১৯৭৮ সালের জানুয়ারীতে কার্টারের ভারত সফরের সময় সাম্রাজ্যবাদী পত্র পত্রিকা-গুলো প্রচার করেছিল যে, এই সফর সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ

সহযোগিতা থেকে ভারতকে "বিশেষকরে মার্কিন-যেঁষা জোটনিরপেক্ষতার ধারায়" নিয়ে আসবে।

১৯৮০ সালের জানুয়ারীতে দিল্লীতে সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা আবার দেখতে পাচ্ছি, ভারতকে তার স্বাধীন নীতি বর্জন করতে বাধ্য করার জন্যে আন্তর্জাতীয় সাম্রাজ্যবাদ প্রচণ্ডতর চাপ দিচ্ছে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে নানা উপায় নেয়া হচ্ছে। ভালবাসা প্রীতি ও বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজী করানোর চেষ্টা থেকে শুরু করে বৈষয়িক সাহায্যের ঢালাও প্রতিশ্রুতির সঙ্গে রয়েছে "সোভিয়েত ভীতি"র কুখ্যাত ভূত দেখিয়ে ভয় দেখানোর চেষ্টা। জানুয়ারী মাসের তিন সপ্তাহে সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমী রাষ্ট্রনেতারা যে সংখ্যায় ভারত সফর করেছে, এর আগের পুরো বছরে সে সংখ্যায় করেনি।

ভারতের পত্র পত্রিকাগুলো এই অস্থির কর্মব্যস্ততার উদ্দেশ্যগুলোকে লক্ষ্য করেছে। কাগজগুলো বলছে যে, সাম্রাজ্যবাদীরা তথাকথিত আফগান প্রশ্নকে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পর্কের মধ্যে একটা গোঁজ ঢুকিয়ে দেয়ার বরাবরকার বাসনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছে। সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতকে বুঝাবার চেষ্টা করছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তান ও চীনকে যে অস্ত্র দিচ্ছে সেগুলো ভারতকে বিপন্ন করবে না; সাম্রাজ্যবাদীরা চেষ্টা করছে যে, ইন্দিরা গান্ধীর সরকার ওয়াশিংটন-লণ্ডন-পিকিং চক্রে যোগ না দিলেও এর বিরোধিতা যেন না করেন। উপরন্তু, এব্যাপারে সাক্ষ্যপ্রমাণ রয়েছে যে, কার্টারের দূত শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে অত্যন্ত স্থূলভাবে এই অঞ্চলে "সহযোগিতামূলক নিরাপত্তা-কাঠামো" গড়ে তোলার মার্কিন পরিকল্পনায় সমর্থন জানাতে বলেছে। এই পরিকল্পনা হচ্ছে, শোচনীয়ভাবে যে সিয়াটো ও সেন্টোর মৃত্যু হয়েছে তাদের পুনর্জীবিত করা। ভারতের বহু সংবাদপত্র বলছে যে, এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য, পশ্চিমী ছকে ভারতকে চলতে বাধ্য করা, তাদের সায়ুযুদ্ধের পুনঃপ্রবর্তনের মতলবের মধ্যে ভারতকে টেনে নেয়ার চেষ্টা চালানো।

ভারতের ওপর এই সাম্রাজ্যবাদী চাপের স্বরূপ উদঘাটন করে দিয়েছে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। ভারত যাতে তার জোট-নিরপেক্ষতার নীতি থেকে সরে না যায়, সেজন্যে চেষ্টা করে যাওয়াকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যের অন্যতম বলে মনে করে। ভারতের সমস্ত

দেশপ্রেমিককে ঐক্যবদ্ধ করে কমিউনিস্ট পার্টি ভারত সরকারের কাছে দাবী রাখছে যে, যত উস্কানিই আসুক না কেন, সরকার যেন জাতির স্বার্থকে সবসময় ধরে থাকেন এবং কোনরকমের উস্কানির কাছে আত্মসমর্পন না করেন।

১৯৮০-সালের শুরু থেকেই আমরা আবার এখন একটা পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি যেটা আমাদের আন্তর্জাতিক উত্তেজনার পুনরুদ্ভবের বিপদে গড়িয়ে দিতে পারে। এই পরিস্থিতির জন্যে পুরোপুরি দায়ী সাম্রাজ্যবাদ। কিন্তু এটাও লক্ষণীয় ব্যাপার যে, সাম্রাজ্যবাদের এই অশুভ নীতিকে ব্যাপকভাবে নিন্দা করা হচ্ছে, কারণ এই নীতি বহু সংখ্যক জাতির জাতীয় সাফল্য এবং সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতাকে বিপজ্জনক ঝুঁকির মধ্যে ঠেলে দিতে চাইছে। এই ধরনের নীতির বিপদ ও অগ্রহণীয়তাকে ২৫ বছর আগে বান্দুংএ এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলো চিহ্নিত করেছিল। আজ জোট-নিরপেক্ষ দেশগুলোর একটি বৃহৎ অংশ আন্তর্জাতিক ব্যাপারে তাদের নব-অর্জিত মর্যাদাকে কাজে লাগাচ্ছে এবং প্রগতি ও অগ্রগতির সম্ভাবনাগুলোকে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার, বিশ্বের সর্বত্র দাঁতাত বা যুদ্ধ পরিহারের ব্যবস্থাকে ছড়িয়ে দেয়ার এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে গায়ের জোরের অবস্থানের নীতিকে পুরোপুরি নাকচ করার প্রয়াসের সঙ্গে যুক্ত করছে। এই পথনির্দেশক ব্যবস্থাগুলো সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোতে এবং পুঁজিবাদী দেশগুলোর প্রগতিবাদী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে গভীর সহমর্মিতা পাচ্ছে। জীবন অনিবার্যভাবে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ এবং প্রতিক্রিয়ার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ব্রতী সমস্ত শক্তির আরো বেশি ঐক্য দাবী করছে।

P 36251

মে দিবস ★ ট্রেড ইউনিয়ন ★ কমিউনিস্টরা

কেমাল ফেরভান
ডব্লিউ এম আর সম্পাদকীয় পর্ষদ সদস্য, পত্রিকায় তুরস্কের
কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি

প্রথম মে দিবসের বিক্ষোভের পর ন'টি দশক পার হয়ে গিয়েছে। যাঁদের রক্তে শিকাগোর রাজপথ রঞ্জিত হয়েছিল ১৮৯০ সালের এই দিনে অনেক দেশের শ্রমজীবী মানুষ পুলিসী হিংস্রতার শিকার হয়ে নিজ শ্রেণীর সেই ভায়েদের স্মৃতির প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেছিলেন। মে দিবসের নবতিতম বার্ষিকী স্মরণ করার সময় আমরা সর্বদাই স্মরণ করি তাঁদের, যাঁরা পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রামে জীবন উৎসর্গ করেছে, আমাদের সংহতির হাত বাড়িয়ে দিই বিশ্বের সব মহাদেশের সেই মানুষদের দিকে যাঁরা শ্রেণী-যুদ্ধের ব্যারিকেডে দাঁড়িয়ে আজও সংগ্রাম করে চলেছেন।

শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন যে-পথ পরিক্রমা করছে তা মোটেই সরল নয়। আমেরিকার শ্রমিকশ্রেণীর এক বিশিষ্ট ব্যক্তি ইউজিন ডেবস্ এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে লিখেছিলেন, "শ্রমিক আন্দোলন হাজার হাজার বার হোঁচট খেয়েছে, মাটিতে পড়ে গেছে, নিজেকে রক্তাক্ত করেছে আবার মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে; কখনও সন্ত্রাসের মুখে ভয়ত্রস্ত হয়েছে, শ্বাসরুদ্ধ হয়েছে কখনও-বা অত্যাচারে নির্জীব হয়ে পড়েছে; আদালত তার বিরোধিতা করেছে, ঠগীরা হামলা করেছে, মিলিশিয়া আক্রমণ করেছে, সৈন্যরা গুলিবিদ্ধ করেছে, সংবাদপত্রগুলি নিন্দা ও ধিক্কার দিয়েছে, জনমত ভ্রূকুটি করেছে, রাজনীতি-বিদরা প্রবঞ্চিত করেছে, পুরোহিতরা ভয় দেখিয়েছে, দলত্যাগীরা নিন্দা করেছে"।*

ডেবসের ঐ উক্তি আজও প্রযোজ্য। শোষকশ্রেণী এখনও শ্রমজীবী জনগণের বিরুদ্ধে দমন-পীড়ন, ব্ল্যাকমেইল ও প্ররোচনার হাতিয়ার ব্যবহার করে শ্রমিক আন্দোলনের নেতাদের গণসংগঠন ট্রেড ইউনিয়নগুলির বিরুদ্ধে প্রচণ্ডতম আঘাত করছে।

---

* ডেবস: হিজ লাইফ, রাইটিংস এণ্ড স্পিচেস, জিরা-ড ১৯০৮ পৃঃ ২৩৯-২৪০।

পুঁজির শিকারের তালিকা দিনের পর দিন লম্বা হচ্ছে। আমাদের দেশের শত শত মানুষও আছেন ঐ তালিকায়। দু-বছর আগে ইস্তানবুলে মে দিবসের মিছিলে অংশগ্রহণকারী ৩০ জনকে পুলিস গুলি করে খুন করে। গত ফেব্রুয়ারিতে তারিশ কৃষি-শিল্প প্রকল্পের ১১০০০ ধর্মঘটী শ্রমিক এবং কেরানী-কর্মচারীর বিরুদ্ধে সরকার সৈন্য, সাঁজোয়াগাড়ি এবং বিমান ব্যবহার করে। ওদের আড়াই হাজার জনকে কারাবন্দী করে। ১৯৮০ সালের গোড়াতে তুরস্কের এবং বিদেশের শ্রমজীবী মানুষের দৃঢ়পণ প্রতিবাদই কেবল মেটাল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের (মাদেন-আই এস) দু-জন ইউনিয়ন নেতার এবং অফিস কর্মচারী ইউনিয়নের একদল সক্রিয় কর্মীর মুক্তি অর্জন সম্ভব করে।

আমার দেশই কেবল ব্যতিক্রম নয়। বিগত কয়েক বছরে এফ আর জি (জার্মান ফেডারেল রিপাবলিক)-র মেটাল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সক্রিয় কর্মীদের একটার পর একটা নিরবচ্ছিন্ন অভিযোগে নির্যাতিত হতে হয়েছে। ফ্রান্সে, শিল্প উদ্যোক্তারা প্রগতিধর্মী ট্রেড ইউনিয়নগুলির বিরুদ্ধে সন্ত্রাস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে লালাল ইউনিয়নের সাহায্য নেয়, ধর্মঘট ভাঙতে ধর্মঘট ভাঙার লোকজনদের নিয়োগ করে। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে ধর্মঘটী সংস্থাগুলির ফ্যাক্টরীর ও অফিস কর্মীদের নাস্তানাবুদ করা তো নিত্যকারের ঘটনা হয়ে উঠেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফ্যাক্টরী মালিকরা কু ক্লুক্স ক্লান-এর সাহায্য গ্রহণে লজ্জা বোধ করে না আর মার্কিন একচেটিয়া পুঁজির সদর দপ্তর ন্যাশনাল এসোসিয়েশন অফ্ ম্যানুফাকচারার্স এসোসিয়েশন ১৯৭৭ সালে ইউনিয়ন মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একটি পর্ষদই গঠন করেছে। জাপানে ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার সমেত সামাজিক-অর্থনৈতিক অধিকার রক্ষার সংগ্রামে অংশ গ্রহণের অভিযোগে হাজার হাজার রেলওয়ে এবং যোগাযোগ শ্রমিকদের অভিযুক্ত করা হয়েছে। চিলি, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, উরুগুয়ে, বলিভিয়া, গুয়াতেমালা ও এল সালভাদর এবং অন্যান্য দেশে হাজার হাজার মানুষ অত্যাচারিত হয়েছেন, কেউ জেলে মারা গেছেন অথবা কারও "নিখোঁজের" তালিকায় নাম ছাপা হয়েছে।

বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলি বহুমুখী ব্যবস্থাবিশিষ্ট নির্মম আইনের ভিত্তিতে দমন-পীড়ন চালায়। এই আইনগুলি শ্রমজীবী জনগণের ও তাদের সংগঠনগুলির অধিকার সংকুচিত করে এবং প্রগতিশীল ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের এবং তাদের

ইউনিয়নগুলির ওপর নিপীড়নকে আইনগত স্বীকৃতি দেয়। তুরস্কের আইন ধর্মঘটের অধিকারকে বেপরোয়াভাবে সংকুচিত করে রেখেছে। সাধারণ ধর্মঘট ও রাজনৈতিক ধর্মঘট, এমনকি সংহতিমূলক ধর্মঘটও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অথচ, ঐ আইনই আবার মালিকদের ও রাষ্ট্রকে লকআউটের অধিকার দিয়েছে এবং অসন্তোষ দমনের জন্য এগুলির অবাধ প্রয়োগ হয়। সরকারী কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়নে যোগদান নিষিদ্ধ।

অবশ্য এ বিষয়ে তুরস্কই একমাত্র ব্যতিক্রম নয়। বৃটেনের রক্ষণশীল সরকারের সমগ্র আইন পরিষদীয় ব্যবস্থাটাই নয় ইউনিয়ন-বিরোধী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনেক আইন আছে যা একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামকে শৃঙ্খলিত করে রাখে এবং স্বাভাবিকভাবেই ধর্মঘট বে-আইনী রাখাটা সুনিশ্চিত করে। ওদিকে লাতিন আমেরিকার সরকারগুলিও "অবাঞ্ছিত" ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপ দমন করার প্রয়াসের অসংখ্য আদেশ এবং আইন জারী রেখেছে।

তবে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের বিরুদ্ধে এবং দমননীতি ও বিচার বিভাগের মাধ্যমে সেগুলির ওপর বৈধতার প্রলেপ আরোপের প্রয়াসটা ইতিহাসে বুর্জোয়াদের শক্তির নয়, দুর্বলতার সাক্ষ্য হয়েই থাকবে। কারণ, দমননীতির চাবুকটা মারা হয় তখনই যখন সামাজিক প্রতিবাদগুলো এমন এক পর্যায়ে উন্নীত হয় "সম্মানজনক" পদ্ধতিতে যার আর মীমাংসা সম্ভব হয় না, যখন আংশিক সুবিধা দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীকে আর সন্তুষ্ট করা যায় না, যখন সংস্কারমূলক ব্যবস্থা শ্রমজীবী মানুষকে "সামাজিক অংশীদারত্বের" শান্তিপূর্ণ পরিবেশের দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে আর সক্ষম হয় না।

শ্রেণীগত ক্রোধের ক্রমবর্ধমান জোয়ারের মোকাবিলার জন্য বুর্জোয়াদের হাতে অবশ্য মতাদর্শগত এবং রাজনৈতিক হাতিয়ারের এক বেশ বড় ও বিচিত্র ধরনের অস্ত্রাগার আছে। অন্যান্যর মধ্যে এর উল্লেখযোগ্য পরিচয় পাওয়া যায়, তুরস্ক সমেত অন্য অনেক দেশে ট্রেড ইউনিয়নকে ক্ষমতার বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্যতম অংশে পরিণত করা, পুঁজিবাদী বিধিব্যবস্থার অঙ্গীভূত করা এবং এইভাবে তাদের শ্রমজীবী মানুষকে শোষণের সহায়ক করে তোলা এবং পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে সংহত করার কাজে ব্যবহার করার প্রয়াসের মধ্যে। বুর্জোয়া রাষ্ট্রে, ব্যবসা এবং ট্রেড ইউনিয়নকে

ঐক্যবদ্ধ করার সৌধটি অতি দক্ষতার সঙ্গে এমনভাবে খাড়া করা হচ্ছে যাতে এই রকম প্রতিভাত হয় যে ট্রেড ইউনিয়নগুলি—এবং তাদের মধ্যেকার শ্রমজীবী জনগণ—সামাজিক-অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সমান অংশীদারে পরিণত হয়েছে।

অস্ট্রিয়া, বৃটেন, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান দেশ এবং আরও কয়েকটি দেশে অর্থাৎ যেখানে ট্রেড ইউনিয়নের উচ্চ-কোটির কর্মকর্তারা গভীরভাবে সংস্কারবাদে আচ্ছন্ন সেখানে "শ্রেণী সংঘর্ষকে নিস্তেজ করার" জন্য একচেটিয়া পুঁজি ও বুর্জোয়া সরকারগুলি "সামাজিক অংশীদারত্বের" তাত্ত্বিক এবং বাস্তবে প্রয়োগকারীদের ব্যবহার করছে। আর্জেন্টিনায় বুর্জোয়ারা শ্রমজীবী মানুষকে দক্ষিণপন্থী পেরনবাদের ফাঁদে ফেলার টোপ দিচ্ছে। ওদেশের শ্রমিক আন্দোলনে ঐ পেরনবাদ পশ্চিম ইওরোপের সোস্যাল-ডেমোক্রাসির সমধর্মী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদ ওদেশের বৃহত্তম ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র এ এফ এল—সি আই ও-র উলঙ্গ প্রতিক্রিয়াশীল, প্রচণ্ড কমিউনিস্ট-বিদ্বেষী নেতৃত্বের সেবা পাচ্ছে।

একচেটিয়া পুঁজির ইউনিয়ন-বিরোধী রাজনীতির একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হল জাতীয় পর্যায়ে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে হীনমন্য করার, সংস্কারবাদী প্রভাবকে শক্তিশালী করার এবং ভিন্ন দেশের প্রত্যেকটি ট্রেড ইউনিয়নকে একে অন্যের থেকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে বিভেদমূলক কার্যকলাপ পরিচালনা করা। তুরস্কের শাসক-চক্র দুটি বৃহৎ ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থার—তুর্ক-ইস এবং কনফেডারেশন অফ রেভলিউশনারি ওয়ার্কার্স (ডি আই এস কে)-এর মধ্যে ঐক্যবদ্ধ কার্যকলাপের প্রয়াসে ফাটল ধরানোর এবং ডি আই এস কে বিভক্ত করার সর্ব প্রয়াস করে চলেছে। মেটাল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের সঙ্গে যে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে তা দেশে ইউনিয়ন-বিরোধী এবং কমিউনিস্ট-বিরোধী অসংযত উন্মাদনা ছড়ানোর কারণ হয়েছে।

বুর্জোয়াদের কাছে ট্রেড ইউনিয়নগুলি চিরদিনই শ্রেণীশত্রু হিসাবে গণ্য, ওরা চায় এগুলি ধ্বংস করে ফেলতে (যদিও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার দোর্দণ্ড প্রতাপশালী নিয়ামকরাও স্বীকার করে একাজ অসম্ভব), নিদেন পক্ষে দুর্বল করে দিতে, সন্ত্রস্ত করতে এবং বিভ্রান্ত করতে। সেকারণেই ট্রেড ইউনিয়ন-

গুলির মূল দৃষ্টিভঙ্গী শ্রেণী-নীতিসমূহের প্রতিষ্ঠাকে আরও তীব্র করার কাজকে ওরা ছেঁটে ফেলার চেষ্টা করে।

ট্রেড ইউনিয়নগুলিই শ্রমজীবী জনগণের বৃহত্তম সংগঠন যার সভ্যসংখ্যা উন্নত পুঁজিবাদী দেশের ৭ কোটি, লাতিন আমেরিকার রাজ্যগুলিতে ১ কোটি ৫০ লক্ষ এবং এশিয়া ও আফ্রিকার আরও কয়েক'শ লাখ, শুধু এ কারণেই রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তাত্ত্বিকরা বিচলিত নয়। বুর্জোয়ারা এটা লক্ষ্য করছে, বৃহত্তম বিপদ আসছে ট্রেড ইউনিয়নগুলির ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক ভূমিকা থেকে, আরও সঠিকভাবে বলতে হলে এদের পুঁজিবাদ বিরোধ অভিমুখিতা থেকে (স্বভাবতই, এদের রাজনৈতিক খেলায় শ্রমজীবী জনগণকে অন্তর্ভুক্ত করায় এদের আপত্তি নেই)।

রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদের বিকাশ, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে বুর্জোয়াদের ক্রমবর্ধমান সক্রিয় হস্তক্ষেপের পরিণতিতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন অনিবার্যভাবে রাজনীতিমুখী হয়। এর ফলে শ্রমজীবী জনগণের অর্থনৈতিক আন্দোলন ক্রমেই বেশি করে প্রায়শই ব্যক্তিগত শিল্প মালিকের সঙ্গেই নয়, বুর্জোয়া রাষ্ট্রের সঙ্গেই সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।

শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রবর্তী বাহিনীগুলি পুঁজিবাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বনিয়াদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক অভিযানে প্রথম পদক্ষেপ শুরু করেছে। এমন কি ট্রেড ইউনিয়নগুলি যখন তাদের আশু দাবির সূত্রায়ন করে, সে সব ক্ষেত্রেও সংকটের গণতান্ত্রিক সমাধানের পথের সন্ধানে সেগুলিকে যুক্ত করে এবং ঐসব কৌশলগত অভিযানগুলি শেষ পর্যন্ত একচেটিয়া পুঁজির সামাজিক-অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক রণনীতির বিরুদ্ধেই চালিত হয়। এই প্রবণতা তুরস্ক অথবা লাতিন আমেরিকাতেও প্রত্যক্ষ করা যায়। যেখানে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদ কেবল তার বিকাশের প্রারম্ভিক পর্যায়ে আছে।

অনেক মাঝারি স্তরের পুঁজিবাদী দেশে, ট্রেড ইউনিয়নগুলি ক্রমবর্ধমান হারে বহুজাতিক কর্পোরেশন-বিরোধী সংগ্রামের প্রথম সারিতে এগিয়ে যাচ্ছে। যেমন, অর্জেন্টিনায় ইউনিয়নগুলি বিদেশী পুঁজির অনুপ্রবেশকে সফলভাবে খর্ব করেছে।

শ্রমজীবী মানুষের শান্তির আকাঙ্ক্ষা অভিব্যক্ত করে, ট্রেড ইউনিয়নগুলি হামেশাই পুঁজিবাদী দেশের সরকারের আগ্রাসী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় এবং সর্বপ্রকারের সমরবাদী জঙ্গীপনার দৃঢ় বিরোধিতা করে। তাঁরা দেঁতাত ও নিরস্ত্রীকরণের সঙ্গে জরুরী সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর মীমাংসার আকাঙ্ক্ষাকে যুক্ত করেন।

শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে ক্রমশ বামপন্থী প্রবণতার বৃদ্ধিতে, এর মধ্যে সুস্পষ্ট শ্রেণী অবস্থান গ্রহণকারী একটা প্রগতিশীল, বিপ্লবী অংশের সংহতিতে একচেটিয়া পুঁজি ভীষণ শঙ্কিত। অনেক ট্রেড ইউনিয়ন, এমনকি যারা সংস্কারবাদী ধারায় অথবা বুর্জোয়া দলগুলির অনুসরণকারী তারাও আর একচেটিয়া পুঁজির ও তাদের সেবাদাস সরকারের নির্ভরযোগ্য অংশীদার থাকছে না।

যেমন তুরস্কে, শ্রমজীবী মানুষের চাপ প্রায়শই তুর্ক-ইস ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থার প্রতিক্রিয়াশীল নেতাদের সরকারের শ্রমিক বিরোধী নীতিগুলিকে আক্রমণ এবং তার অর্থনৈতিক নীতির সমালোচনা করতে বাধ্য করে। বৃটেনে অনেক ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে লেবার পার্টির দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের (যারা ঐ সব ট্রেড ইউনিয়নেরও সদস্য), মধ্যে সংঘাতের মাত্রা ক্রমেই বাড়ছে। অনুরূপ ঘটনা ঘটছে, অস্ট্রিয়া, স্পেন, ইউ এস এ, ফ্রান্স, এফ আর জি, বেলজিয়াম ও লাতিন আমেরিকার ট্রেড ইউনিয়নগুলির কার্যকলাপে।

শ্রমজীবী মানুষের দৃঢ়পণ সংগ্রাম যে কোন দেশের গণতন্ত্র-বিরোধী রাজত্বে, এমন কি ৬৭ টার মধ্যে ২০টি প্রদেশে জরুরী অবস্থা জারি আছে, এরকম দেশেও সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, ১৯৭০-এর জুন ডি আই এস কে সংগঠিত দু-দিনের সাধারণ ধর্মঘট যা কার্যত শ্রেণী ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাকেই নিষিদ্ধ করত, এমন একটি বিলকে আটকে দেয়। ১৯৭৬-এর সেপ্টেম্বরের সাধারণ ধর্মঘট পার্লামেন্টে প্রতিক্রিয়াশীল সদস্যরা রাজনৈতিক মামলাগুলির জন্য "বিশেষ ট্রাইবুন্যাল" বসানোর যে পরিকল্পনা করে তা পরিত্যাগে বাধ্য করেছিল।

শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের বর্তমান অধ্যায়ের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যটি ধর্মঘটের গতিপ্রকৃতির সবথেকে ঘনীভূত চেহারার মধ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এটিই তো প্রলেতারিয়েত ও তার মিত্রদের এক পরীক্ষিত হাতিয়ার। বিগত কয়েক

বছরে তুরস্কে ধর্মঘটের সংখ্যার যথেষ্ট বৃদ্ধি হয়েছে। এবছরের বসন্তের মাস কটিতেই ১০০,০০০ তুর্কী শ্রমিক হয় ধর্মঘট করছিলেন অথবা ধর্মঘটের নোটিশ দিয়েছিলেন। সমগ্র পুঁজিবাদী দুনিয়াজুড়ে প্রসারমান ধর্মঘট আন্দোলন অনস্বীকার্য উচ্চ মাত্রার সাংগঠনিক স্তরের এবং শ্রমিকশ্রেণীর কঠোর সংকল্পের অনমনীয় দৃঢ়তার পরিচায়ক।

ধর্মঘট সংগ্রাম মেহনতি কৃষক, বুদ্ধিজীবী, শহুরে ও গ্রামীণ মধ্যবিত্ত অংশ এবং যুবক—প্রলেতারিয়েতের এই মিত্রদের নিয়ে ক্রমবর্ধমানভাবে এক গণ-কর্মকাণ্ডে পরিণতি লাভ করছে। বহুজাতিক করপোরেশনগুলির শোষণের মাত্রার তীব্রতা বৃদ্ধির সঙ্গে শ্রমজীবী মানুষ রাষ্ট্রের সীমানা ছাড়িয়ে পরস্পরকে সাহায্য করছে এবং আন্তর্জাতিক সংহতিকে শক্তিশালী করছে।*

বুর্জোয়া সরকারগুলি শ্রমিক-বিরোধী, ইউনিয়ন-বিরোধী নীতি অনুসরণ করা সত্ত্বেও কেন ধর্মঘট আন্দোলনের বৃদ্ধিকে মন্থর করে দিতে ও ধর্মঘটের লক্ষ্যকে সীমিত করার সর্বতো প্রয়াস করছে এরই মধ্যে তার জবাব নিহিত আছে। ঠিক এ কারণেই ধর্মঘট সংগ্রামের সংগঠকরা, যারা সংগ্রামের পুরো-ভাগে থাকে—ট্রেড ইউনিয়নের সক্রিয় কর্মী, ধর্মঘট কমিটি সদস্য এবং পিকেটাররা—আদালতের অভিযোগের এবং প্রতিক্রিয়ার হিংস্রতার প্রধান শিকার হয়।

দমননীতি যতই নৃশংস হোক না কেন ওরা ভেঙে পড়ে না এবং শ্রমজীবী মানুষের অঙ্গী মেজাজকেও ভাঙা যায় না, কারণ ওদের কাছে দিনের পর দিন স্পষ্ট হচ্ছে যে, সমস্ত অন্যায়ের উৎস একচেটিয়া পুঁজির সঙ্গে দৃঢ়পণ প্রত্যক্ষ সংঘর্ষই হল সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকগুলি থেকে মুক্তিলাভের একমাত্র পথ। ওরা জানে ওদের সমর্থনে আছে প্রগতিশীলরা যার প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে কমিউনিস্টরা। যারা ওদের স্বার্থ রক্ষায় এবং ওদের সংগঠিত বাহিনী ট্রেড ইউনিয়নগুলি রক্ষার জন্য তাদের নৈতিক এবং রাজনৈতিক মর্যাদার সমগ্র শক্তিটা ব্যবহারে প্রস্তুত।

---

* উন্নত পুঁজিবাদী দেশে ধর্মঘট আন্দোলন সম্পর্কিত পরিসংখ্যানগত এক সমীক্ষা কিছুটা বিস্তারিতভাবে ডবলিউ এম আর-এর এই সংখ্যায় "শ্রেণী সংগ্রামের ফ্রন্টে" শিরোনামায় আলোচনা করা হয়েছে।

কমিউনিস্টদের দৃষ্টিভঙ্গী পরিস্থিতির বিবেচনার দ্বারা নির্ধারিত হয় না। কমিউনিস্ট পার্টিগুলি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের কর্তব্যকেই অস্তটার বিকল্প হিসেবে দেখে না। যখন সাম্যবাদের ভূত সবে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয় সে সময়েই মার্কস ও এঙ্গেলস লিখেছিলেন, কমিউনিস্টদের "সমগ্র প্রলেতারিয়েতের স্বার্থের বাইরে পৃথক কোন স্বার্থ নেই।"* কমিউনিস্টরা ট্রেড্ ইউনিয়নের প্রতি তাদের সমর্থনকে পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামের প্রতি তাদের অবদান রূপে গণ্য করে।

কমিউনিস্টরা জানে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন কোন্ রাজনৈতিক শক্তির পক্ষে—আধুনিক সামাজিক বিকাশের ভবিষ্যৎ অনেক পরিমাণে তার ওপর নির্ভরশীল। মার্কসবাদীদের কাছে এ হল পুঁজিবাদী দুনিয়ায় বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনের মূল সমস্যাগুলির একটি। মার্কস লিখেছিলেন, "পুঁজি এবং শ্রমের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধের জন্য ট্রেড ইউনিয়নগুলির যদি প্রয়োজন হয়, তবে মজুরির শ্রম এবং পুঁজি-শাসনের ব্যবস্থাটাকেই বদলে দেওয়ার জন্য একটা সংগঠিত সংস্থা হিসেবে তারা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ।"**

অবশ্য এর অর্থ এই নয়, আমরা কমিউনিস্টরা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের দুর্বলতার প্রতি, ধরা যাক, কোন কোন ট্রেড ইউনিয়নের "গোষ্ঠী"গত সংকীর্ণ দায়িত্ব পালনের কাজে আবদ্ধ থাকার প্রতি অন্ধ থাকি; অথবা কমিউনিস্টরা পুঁজিবাদী দেশের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ওপর সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক সংস্কারদাবী এবং কখনও কখনও পুঁজিবাদের ভাড়াটে দালালদের সুস্পষ্ট প্রভাবের দরুন এখনও যে অসুবিধ সৃষ্টি হয় তাকে তুচ্ছ মনে করে।

কিন্তু এসব কিছু সত্ত্বেও ট্রেড ইউনিয়নের অধিকারের ওপর হামলা হলে কমিউনিস্টরা নির্দ্বিধায় ট্রেড ইউনিয়নের সমর্থনে দাঁড়ায়। এ ক্ষেত্রে চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, শ্রমজীবী মানুষের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির, দেঁতাত এবং নিরস্ত্রীকরণের জন্য সংগ্রামের বাস্তব প্রয়োজন ক্রমশ ট্রেড ইউনিয়ন এবং কমিউনিস্টদের মধ্যে অনেক অবস্থানের সাযুজ্য প্রতিষ্ঠা করছে।

---

* কার্ল মার্ক্স এণ্ড ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস, সিলেকটেড্ ওয়ার্কস, ৩ খণ্ডে, খণ্ড ১, পৃঃ ১১৯।

** ঐ গ্রন্থ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮০।

সঙ্গে সঙ্গে, কমিউনিস্টরা ভাল করেই জানে ট্রেড ইউনিয়ন ক্রিয়াকলাপের দুর্বল দিকগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে নয় পরন্তু শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে প্রচণ্ড কাজের মাধ্যমেই সেগুলি অতিক্রম করা সম্ভব। এ কারণেই লেনিন জোরের সঙ্গে বলতেন, ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্যে টেনে আনতে হবে এবং ওদের বিপ্লবী সোস্যাল ডেমোক্রাটিক আন্দোলনের মধ্যে সম্ভাব্য ঘনিষ্ঠতম যোগসূত্র বজায় রাখতে হবে (কালেক্‌টেড ওয়ার্কস, ১৩ খণ্ড, পৃঃ ৪৬০) অভিজ্ঞতা, আমাদের পার্টিরও, সুন্দরভাবে প্রমাণ করেছে, পুঁজিবাদী দুনিয়ায় শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের অভিমুখিতা ও কার্যকারিতা নির্ভর করে শ্রমজীবী মানুষের রাজনৈতিক সংগ্রাম যারা পরিচালনা করে সেই কমিউনিস্টদের সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়নগুলির, যারা নির্দিষ্ট, প্রধানত সামাজিক অর্থনৈতিক দাবির ওপর গণসংগ্রাম সংগঠিত করে, সংযোগ সূত্র কত বিস্তৃত এবং গভীর, তার ওপর।

কমিউনিস্টরা নিরলসভাবে একথাটা বোঝানোর চেষ্টা করে, ট্রেড ইউনিয়নে ভাঙন শ্রমিক এবং অফিস কর্মীদের স্বার্থকে গুরুতর বিপর্যস্ত করে, এবং একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে অভিন্ন সংগ্রামে অ-একচেটিয়া পুঁজির অংশকে জমায়েত করার শক্তি ও ক্ষমতাকে দুর্বল করে। তারা শ্রমজীবী মানুষের শ্রেণী স্বার্থ রক্ষার ভিত্তিতে ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা করছে। এখানে মতপার্থক্যের বিষয় হল, ১৯৭৬-এর গ্রীষ্মকালে বার্লিনে অনুষ্ঠিত ইউরোপীয় কমিউনিস্ট এবং ওয়ার্কার্স পার্টিগুলোর সম্মেলনে বলা হয়, "শ্রমিকশ্রেণীর প্রভাব বাড়ছে এর ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াসের মাধ্যমে।"* ১৯৭৫ সালে লাতিন আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির সম্মেলনে গৃহীত দলিলে বলা হয়, "বিপুল অভিজ্ঞতা প্রমাণ দেয় যে শ্রমিকশ্রেণীর প্রভাব, সামাজিক প্রগতির মহান সংগ্রামে নতুন বাহিনীকে টেনে আনতে সাহায্য করে।"**

আমি যা ভেবে কথাটা বলছি তা হল জাতীয় নয় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ঐক্য। এ ধরনের এক ঐক্যের উদাহরণ হল বিশ্ব-ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন

* ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ, ৭ আগস্ট, ১৯৭৬।

** গ্রানমা, ২২ জুন, ১৯৭৫।

যা বিভিন্ন দেশের ট্রেড ইউনিয়নগুলির কর্মতৎপরতাকে যুক্ত করার, নতুন অভিমুখিতার এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রগুলির সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা এবং ঐক্যবদ্ধ ক্রিয়াকলাপের জন্য ৩৫ বছর ধরে চেষ্টা করছে।

কমিউনিস্টদের কাছে দায়িত্বটা কেবল, ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে নৈতিক এবং রাজনৈতিক সমর্থন দানই নয়। তারা বিশ্বাস করে এই সংগঠনগুলির অবস্থান কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মতাদর্শগত রাজনৈতিক পথ-নির্দেশনার প্রভাবের মাধ্যমেও শক্তিশালী হতে পারে। আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর প্রধান ঝোঁকগুলির মার্কসবাদ ভিত্তিক মূল্যায়ন, পুঁজিবাদী দেশের ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে বিশ্বের শক্তি বিন্যাস, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এবং একচেটিয়া পুঁজি-বিরোধী সংগ্রামের পথ ও উপায় এবং সংগ্রামের চূড়ান্ত লক্ষ্যের ন্যায় জটিল প্রশ্নাবলীকে ভালভাবে বুঝতে সাহায্য করে। অর্থনৈতিক সংকটের কারণ এবং ফলাফলে মার্কসীয় বিশ্লেষণ ট্রেড ইউনিয়নগুলির সামাজিক-অর্থনৈতিক কর্মসূচীতে ক্রমেই বেশি প্রতিফলিত হচ্ছে এবং শ্রমজীবী জনগণের কল্যাণ সমাধানের উদ্দেশ্যে সংকট অতিক্রম করার পথ অনুসন্ধানের কাজে তাদের প্রভাবিত করে।

শ্রেণীগত দায়িত্ব পালনের স্বার্থে কমিউনিস্টরা, ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে সংগ্রামী ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করার এবং "শ্রেণী সমকওতার" বাহনে পরিণত করার জন্য একচেটিয়া পুঁজি এবং বুর্জোয়া সরকারের প্রয়াসের বিরুদ্ধে কঠোর দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে। ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে শক্তিশালী করার, তাদের ভূমিকা বাড়িয়ে তোলার এবং রাষ্ট্রের সামাজিক-অর্থনৈতিক নীতিকে প্রভাবিত করার অবস্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য তারা, যা করা সম্ভব তা-ই করে। কমিউনিস্টরা সংস্কারবাদী ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে বামপন্থী শক্তির সঙ্গে তাদের যোগাযোগকে সম্প্রসারিত করে। তুরস্কের কমিউনিস্ট পার্টি তার কর্মসূচীতে ঘোষণা করেছে, "ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে বুর্জোয়া নীতির হাতিয়ার করার বিরুদ্ধে, দালাল ট্রেড ইউনিয়নবাদের বিরুদ্ধে পার্টি এক নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালাচ্ছে।"*

আধুনিক সমাজ যে বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে আছে ও বিকশিত হচ্ছে তা শ্রেণী সংগ্রামকে ম্লান করার পরিবর্তে তীব্রতর করছে। রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া

* তুর্কী কমিউনিস্ট পার্টি, প্রোগ্রাম, ইস্তাম্বুল। ১৯৭৮, পৃঃ ৪৯।

পুঁজিবাদের বিকাশ এবং বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লব শুধু পুরাতন বিরোধগুলিকেই তীব্র করছে না, সেই সঙ্গে নতুন সামাজিক দ্বন্দ্বের জন্ম দিচ্ছে। শ্রমজীবী মানুষ বর্ধিত মাত্রার শোষণ এবং যুদ্ধ প্রস্তুতির সমস্ত বোঝাটাই বহন করছে। ঐতিহাসিক উদ্যোগ হারিয়ে ফেলার ফলে পুঁজিবাদ তার নিজ দেশগুলিতে অবস্থান রক্ষার জন্য ক্রমবর্ধমান হিংস্র দমনপীড়নের আশ্রয় নিচ্ছে। ঘটনা যখন এই, ট্রেড ইউনিয়নগুলি শ্রেণী সংগ্রামে আরও বৃহত্তর ভূমিকা পালন করবে এবং এই সংগঠনগুলি পুঁজিবাদীশ্রেণীর ক্রমবর্ধমান চাপের সম্মুখীন হবে। কমিউনিস্টরা ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে মতাদর্শগতভাবে সজ্জিত করা এবং সাংগঠনিকভাবে সাহায্য করা কর্তব্য বলে গণ্য করে।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের পেছনের ইতিহাসের দিকে তাকালে প্রমাণ হয় যে এ নিজে এবং এর বৃহত্তম সংগঠন ট্রেড ইউনিয়নগুলি কতদূর এগিয়ে গেছে: আট ঘণ্টা কর্মদিবসের দাবি থেকে—১৮৯০'র মে দিবসের স্লোগান—বর্তমানে শ্রমজীবী মানুষের রাজনৈতিক এবং সামাজিক অর্থনৈতিক অধিকারের সংহত এবং সম্প্রসারণ ও চূড়ান্ত লক্ষ্য মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের অবসান। কিন্তু মে দিবসের মিছিলের স্লোগান যা-ই হোক কমিউনিস্ট ইশতেহারের সেই মূল স্লোগান আজও আছে এবং থাকবে—"দুনিয়ার শ্রমিক এক হও।"—এটা পুঁজির বিরুদ্ধে শ্রমের ঐক্যের সামাজিক সাম্য ও ন্যায়ের আদর্শের ভিত্তিতে পৃথিবী গড়ার ডাক।

ঘটনার নেপথ্য কাহিনী

শ্রমিকরা ধর্মঘটের শিক্ষা ব্যাখ্যা করছেন

"সংগ্রামে দৃঢ় থাকা সত্ত্বেও এবং জনগণের সমস্ত অংশের সমর্থন থাকা সত্ত্বেও শ্রমজীবী জনগণ তাঁদের লক্ষ্যে পৌঁছতে ব্যর্থ হচ্ছেন। কেন? তাদের ভুল কী হচ্ছে? তারা কি সংগ্রামের সঠিক পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন? এই সব প্রশ্নে লা প্লাটা, বরিসো এবং এনসোনাডার শ্রমজীবী জনগণ ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা মত-বিনিময় করেন। এতে অংশগ্রহণকারীরা বলেন যে, আলোচনার উদ্দেশ্য হোলো শিক্ষা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ যা ভবিষ্যতে সংগ্রামকে সাহায্য করবে।" (ইনফর্মে পত্রিকা থেকে)

আর্জেন্টিনার রাজনৈতিক অবস্থার বৈশিষ্ট্যের পটভূমিতে যে পরিস্থিতির মধ্যে শ্রমিকশ্রেণীকে তার সংগ্রাম চালাতে হচ্ছে, তাকে খুবই জটিল বলে বর্ণনা করা যায় এবং শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের ঐক্যকে বিনষ্ট করার প্রচেষ্টা সরকারী হস্তক্ষেপের দ্বারা ট্রেড ইউনিয়ন কাজকর্ম বন্ধ করে দেওয়া ও নেতাদের নিপীড়নের মাধ্যমে তা হচ্ছে। সামরিক জুন্টার নীতি হলো অর্থমন্ত্রী মার্টিনেস ডি হোজ-এর আর্থিক নীতি রূপায়িত করা—এর মধ্যে বহুজাতিক সংস্থাগুলোর স্বার্থই প্রকাশ পায়। শ্রমিকশ্রেণী এই নীতির ফল হিসেবে অতি শোষণের যন্ত্রণা অনুভব করে। এটা বিশেষ করে দীর্ঘতর শ্রমসময়, বি-জাতীয়করণ, সংস্থার ক্লোজার (মূলত সরকারী পরিচালনাধীন)-এর মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায় যার ফলে বেকারত্ব ক্রমাগত বেড়ে চলে; মজুরি হ্রাস পায়, যার জন্য জীবনযাত্রার উচ্চতর ব্যয় নির্বাহ করা যায় না।

এর প্রত্যুত্তরে, অসুবিধা সত্ত্বেও শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন নতুন ধাঁচের সংগঠন গড়ে তুলছে, যে সংগঠন সংগ্রামে সাফল্য আনবে, এবং ১৯৭৯ সালের শেষ থেকে এই সংগ্রাম বাড়ছে এবং সরকারি নীতির ফলে উদ্ভূত সমস্যা-গুলোর সমাধান লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। কমিউনিস্টরা সক্রিয়ভাবে এই সংগ্রামে অংশ নিচ্ছে।

যে সংগ্রামে সাফল্য আসে নি, কিন্তু পরাজয়ের কারণ বের করার জন্য

এবং একই ভুলের পুনরাবৃত্তি না করার জন্য চেষ্টা চলছে, আমরা তাদের সাথে আমাদের অভিজ্ঞতার বিনিময় করতে চাই। কমিউনিস্ট শ্রমজীবী মানুষ এই কাজে সক্রিয়ভাবে রয়েছেন। লা প্লাটা, এনসোনাডা, ও বরিসোর (বুয়েনস এয়ারেসের ৬০ কিলোমিটার দক্ষিণে) মাংস প্যাক করার কারখানার শ্রমিকদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা এগুলো। শ্রমজীবী মানুষেরা তাঁদের ব্যর্থতার কারণ বিশ্লেষণ করার জন্যে একটি সভা করেন।

একজন শ্রমিকের সিদ্ধান্ত হোলো: "সবসময় অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘটের ডাক দেওয়া ঠিক নয়, কারণ এতে শেষপর্যন্ত শ্রমিকের জঙ্গী মেজাজ নষ্ট হয়ে যায় এবং ফলে তারা সংগ্রামে বিমুখ হয়ে যায়, কারণ তার ফলাফল শূন্য।" এই অবস্থায় একটানা ধর্মঘট কর্তৃপক্ষের কাছে সুবিধাজনক হয়ে ওঠে, কারণ সে তার উৎপাদন রপ্তানী না করতে পারার দরুন চুপচাপ বসে থাকে। যদি শ্রমিকদের সোজাসুজি ছাঁটাই করা হয়, তবে তাদের সামাজিক বীমার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। সে ক্ষেত্রে এই আশা নিয়ে তাদের কম মজুরি দেওয়া হতো যাতে তারা কাজ বন্ধ করবে তার ফলে তাদের এই অধিকারও হারাবে।

সভায় আর একটি নেতিবাচক দিক উল্লেখ করা হয়; ধর্মঘটের সংহতি সংগঠনে জনগণের মধ্যে প্রয়োজনীয় কাজের অভাব, বিশেষ ক'রে আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশিদের জড়িয়ে ফেলার ক্ষেত্রে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা যার সমাধান ধর্মঘটীদের প্রাথমিক প্রয়োজন (খাদ্য ইত্যাদি) মেটাতে সাহায্য করে। দৃঢ়তর সংহতি বিশেষভাবে প্রয়োজন, যখন মালিকরা অর্থনৈতিক জটিলতা দূরীকরণের জন্য ধর্মঘটের অছিলায় শ্রমিকদের ছাঁটাই করে এবং তাদের মধ্যেকার সক্রিয় কর্মীদের ছাঁটাই ক'রে সংগঠিত প্রতিরোধকে ভাঙতে উদ্যত হয়। এই অবস্থায় সার্বজনীন সংহতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, এবং সাম্প্রতিক ঘটনাবলী থেকে দেখা যায় যে, সরকার এবং মালিকরা পিছু হঠতে বাধ্য হয় এবং জনসাধারণের চাপে ছাঁটাই শ্রমিকদের পুনর্বহাল করে।

আট ঘন্টা শ্রমদিবস রক্ষা করাটা কমিউনিস্ট শ্রমজীবী মানুষের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। সভায় একজন শ্রমিক বলেন যে, প্রলেতারিয়েতের এই সাফল্য থেকে পিছু হঠার অর্থ আরও বেশি শোষণের পথ ক'রে দেওয়া।

উপরন্তু এটা সংকটের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া ও কম মজুরি গ্রহণের মানসিকতা শ্রমিকদের মধ্যে গড়ে উঠতে সাহায্য করে। বর্তমান অবস্থার সাথে শ্রমিকদের মানসিকতা "খাপ খাওয়ানো" অর্থমন্ত্রী মার্টিনেস্ ডি হোজ্-এর অর্থনৈতিক নীতির অন্যতম একটি কর্তব্য, যার দুটি লক্ষ্য: একদিকে অতি শোষণ (১২ থেকে ১৪ ঘণ্টা শ্রমদিবস) ও উচ্চতর মুনাফা, অন্যদিকে শ্রমিকের প্রলেতারীয় চেতনা নষ্ট করা।

এইসব সমস্যার মুখোমুখি হ'য়ে কমিউনিস্ট শ্রমিকরা সমস্ত সংস্থায় কমিশন গঠনের কথা বলে। এটা শুধুমাত্র গণতন্ত্রের প্রয়োজন মেটাবার জন্যই নয়, পরন্তু সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি ব্যবহারের জন্য, শ্রমজীবী জনগণকে শ্রেণী চেতনায় দীক্ষিত করার জন্য, আট-ঘণ্টা শ্রমদিবস সমেত অতীতের সাফল্যকে রক্ষা করার জন্য।

সামগ্রিকভাবে, বিষয়টা হোলো, ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্বে সংস্কারবাদী নয়, শ্রেণীচেতনাসম্পন্ন লোক থাকা দরকার, যাদের শ্রেণীসংগ্রামে জয়-পরাজয়ের অভিজ্ঞতা আছে।

শ্রমিকশ্রেণীর সাফল্য সুনিশ্চিতকারী সংগ্রামের পদ্ধতি ও শ্রেণীচেতনা উন্নত করার জন্য, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের আলোচনার জন্য ভিক্টোরিও কডভিলা কেন্দ্র আগেকার ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের অভিজ্ঞতা সংবলিত পুস্তিকা প্রকাশের প্রস্তাব করে। এই উদ্যোগে বহু কমরেডের উৎসাহ দেখা যায়। ১৯৮০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বাংকো পপুলারের হাজার হাজার কর্মচারী যখন সংগ্রাম শুরু করেন, তখন **সংগ্রামের অভিজ্ঞতা ও ব্যাংক কর্মচারীদের ঐক্য** নামে পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। এর লেখক কার্লোস ইমিসুজ্ ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ও রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন; আজ যখন সংস্কারবাদী ধ্যানধারণার ফলে ব্যর্থতা দেখা দিচ্ছে, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সেই নতুন ও জটিল পরিস্থিতিতে এই অভিজ্ঞতা বিশেষ প্রয়োজন।

এতক্ষণ যা বলা হলো তার থেকে এটা প্রতিপন্ন হয় যে, বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও সংগ্রাম শুধু বৃদ্ধিই পাচ্ছে না, সঠিক পথ ধরে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে সক্রিয় প্রয়াস চালাচ্ছে। সরকার ও মালিকদের দমনমূলক নীতি সত্ত্বেও সংগ্রামের এই পথে সাফল্য অর্জিত হবে।

লিওনার্ডো পাসো

তিরিশে সেপ্টেম্বর ঃ সত্য ও মিথ্যা

সত্যজায়া সুদিমান
ইন্দোনেশিয়া কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের সদস্য

১৯৬৫-র শরৎকালের সেই মর্মন্তুদ ঘটনাবলীর (যা "৩০শে সেপ্টেম্বরের ঘটনা" হিসেবেই সুপরিচিত(১)) পর ১৫ বছর পার হয়ে গিয়েছে।

ঐ ঘটনায় অংশগ্রহণকারী এবং মেকী অংশগ্রহণকারীদের বিচারের কাগজপত্র সমরবিভাগের কড়া সেন্সরের পর সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া আরও অনেক তথ্য জানা গিয়েছে। কিন্তু এখনও বর্তমান প্রশাসন ৩০শে সেপ্টেম্বর এবং ১লা অক্টোবরের রাত্রে ঠিক কী ঘটেছিল সে সম্পর্কে নীরব। ঘটনা সম্পর্কিত সরকারী ভাষ্যে প্রধান তথ্যগুলি এড়িয়ে পরবর্তী ঘটনাবলীকে বিশেষ করে জাকার্তা সম্পর্কিত নাটকটিকে দারুণ অতিরঞ্জিত করেছে। সরকারী ভাষ্যের কেন্দ্রবিন্দু হল এখন যাকে "৩০শে সেপ্টেম্বরের আন্দোলন" বলা হচ্ছে সেই ক্যু'র কর্মকাণ্ডের "প্রেরণাদাতা, সংগঠক এবং নেতা" হিসেবে ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টিকে (সি পি আই) চিহ্নিত করা। এই সাজানো ভাষ্য সম্ভবত সব থেকে ভাল জানা যাবে সদ্য প্রকাশিত এক সরকারী দলিলে। এর প্রকাশক গোয়েন্দা বিভাগ ইন্দোনেশিয়ায় যার নাম কপকামতিব(২)-এই সংস্থাটি নৃশংস দমনপীড়নের জন্য কুখ্যাত।

ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি "কপকামতিব-এর কাছে সি পি আই'র জবাব"-এ অসংখ্য তথ্যের নিবিড় বিশ্লেষণের ভিত্তিতে "সেপ্টেম্বর ত্রিশের ঘটনাবলী" প্রকৃত গতিপথের বর্ণনা দেয়। আমরা মনে করি ১৫ বছর আগে প্রকৃত কী ঘটেছিল তার বিবরণ ডব্লিউ এম আর-এর পাঠকদের জানা উচিত। কারণ ইন্দোনেশীয় সরকারের কমিউনিস্ট বিরোধী প্রচারের মূল অঙ্গই হল "সেপ্টেম্বর ৩০-এর আন্দোলনকে" সি পি

---

১ ১৯৬৫ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর রাত থেকে ১লা অক্টোবর প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ-র সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রশাসনকে দক্ষিণপন্থী প্রতিবিপ্লবীরা এক ক্যু-এর মাধ্যমে উৎখাতের প্রয়াসকে দেশপ্রেমিক সামরিক অফিসারদের একটি দল প্রতিহত করার চেষ্টা করেন।

২ নিরাপত্তা এবং শৃংখলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার ফিল্ড কমাণ্ড।

আই-এর জঘন্য "বিশ্বাসঘাতকতা" বলে চিত্রিত করা এবং সর্বক্ষেত্রেই কমিউনিস্ট ও গণতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে দমনপীড়ন ও নৃশংসতার "অজুহাত" হিসেবে ব্যবহার করা।

১৯৬০-এর গোড়ার দিকে ইন্দোনেশিয়ায় "নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র" নামে এক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এর নেতা প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ ছিলেন জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের এক সম্মানিত ব্যক্তিত্ব এবং এক বিশিষ্ট প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী। ঐ সরকারের নীতির প্রগতিশীল এবং ইতিবাচক দিক ছিল প্রধানত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা। ইন্দোনেশিয়ার জনগণের এবং সুকর্ণের নেতৃত্ব অনুসরণকারী রাজনৈতিক শক্তিগুলি যেমন পার্তিন্দো (পার্টি অফ ইন্দোনেশিয়া), ন্যাশনাল পার্টি এবং অন্যান্যরা ঐ নীতি সমর্থন করত। সুকর্ণ প্রশাসনের ঐ দিকগুলির প্রতি কমিউনিস্ট পার্টিরও সমর্থন ছিল এবং স্বভাবতই কমিউনিস্ট পার্টি-অনুগামী জনগণেরও সমর্থন ছিল।

তবে সুকর্ণপন্থী হিসেবে পরিচয় দিয়েও সামরিক বাহিনীর নেতৃত্বের কমিউনিস্ট-বিদ্বেষী দক্ষিণপন্থীরা, মুসলিম পার্টিগুলি এবং এমনকি ন্যাশনাল পার্টিও সি পি আইকে হীনমন্য করার, এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার এবং জনগণ ও প্রেসিডেন্টের চোখে অপদস্থ করার চেষ্টা চালিয়ে যায়। সামরিক কর্তৃপক্ষ প্রত্যক্ষ দমন-পীড়ন বজায় রেখেই কমিউনিস্টদের কার্যকলাপে সর্বপ্রকারে বাধার সৃষ্টি করে। এই শক্তিগুলি "নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রকে" একটা আপস-রফার সরকার বিবেচনা করত যা তাদের সাময়িকভাবে মেনে চলতে হবে কেননা দেশে তখন ছিল এক শক্তিশালী কমিউনিস্ট পার্টির অস্তিত্ব যে দেশপ্রেমিক প্রেসিডেন্টকে সমর্থন করে।

ইতিমধ্যে পুঁজিপতি এবং আমলারা অনবরত প্রশাসনের মধ্যে তাদের অবস্থানকে শক্তিশালী করে এবং সামরিক বাহিনীর জেনারেলদের একটি গোষ্ঠী এর নেতৃত্বের ভূমিকা নেয়। ঐ জেনারেলরা একদিকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বাগাড়ম্বর ও অন্যদিকে সিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করে এবং রাজনৈতিক শক্তির যে দুর্বল ভারসাম্য ছিল তা নিজেদের অনুকূলে টেনে নেওয়ার চেষ্টা করে—যদিও তা সফল হয় নি। এজন্য তারা কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব সংযত করার, সমস্ত উদ্যোগের ক্ষেত্রে এবং প্রেসিডেন্টের কমিউনিস্ট সমর্থিত কার্যকলাপে বাধা সৃষ্টির ব্যবস্থাবলী গ্রহণ করে। ১৯৬৫'র

গ্রীষ্মকালে মালয়েশিয়ার সঙ্গে সংঘর্ষের অজুহাত(৩) দেখিয়ে দক্ষিণপন্থী জেনারেলরা সামরিক জেলাগুলির কমাণ্ডারদের হাতে ঐসব এলাকার ওপর পূর্ণ খবরদারীর, কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার তুলে দেন। পাশাপাশি, সেনাবাহিনীর ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ-কে আরও সংহত করে।

এরকম এক পরিস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ সাম্রাজ্যবাদী গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে যুক্ত একটি চক্রান্তকারী সংগঠন, যার লক্ষ্য হল ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে বলপূর্বক পরিবর্তন করা, সেই "কাউন্সিল অফ জেনারেলস" এর অস্তিত্বের কথা জানতে পারেন। ঐ চক্রটির নাম যাই হোক এর সরকার বিরোধিতা এবং একটি প্রতিবিপ্লবী ক্যু-এর পরিকল্পনা রচনা সংক্রান্ত কর্মতৎপরতা ছিল তর্কাতীত ঘটনা। প্রেসিডেন্ট, প্রগতিশীল এবং গণতান্ত্রিক অবস্থানে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দল ও মহলগুলির ওপর এবং সেনাবাহিনীর প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদীদের ওপর নির্ভর করে বিশ্বাসঘাতকদের প্রতিহত করার কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু সুকর্ণর পেটি-বুর্জোয়া চিন্তা জনিত প্রধান দুর্বলতাটাই তাঁর মারাত্মক পরিণতির কারণ হয়। তিনি জনগণের কাছে হাজির না হয়ে আর এক পাল্টা চক্রান্তের মাধ্যমে "সেনাবাহিনীর শীর্ষ নেতাদের বিতাড়নের" সিদ্ধান্ত নিলেন।

জেনারেলদের ক্যু ঠেকাতে প্রেসিডেন্ট যে গোষ্ঠীর ওপর নির্ভর করলেন তাদের মধ্যে এমন ব্যক্তিরাও ছিল যারা ঘোলা জলে মাছ ধরার এবং নিজেদের স্বার্থপূরণের আশায় প্রেসিডেন্টের সঙ্গে যোগ দেয়। এরা ছিল "সৈন্যদলে আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী" ব্যক্তির দল। এই জেনারেলদের অতীত পটভূমি হল, হয় পুঁজিপতি অথবা আমলতান্ত্রিক এবং পদমর্যাদার বিচারে "কাউন্সিল অফ জেনারেলস" যাদের পিছনের সারিতে ঠেলে দিয়েছিল। এরাও সর্বোচ্চ জেনারেলদের মত কমিউনিস্ট-বিরোধী, এরাও ইন্দোনেশিয়ায় পুঁজিবাদের পুঁজিপতি এবং আমলাতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ছিল উদ্বিগ্ন, তবে ঐসময়ে এরা বুঝেছিল ওদের স্বার্থেই প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিরোধিতা থেকে নিবৃত্ত থাকা উচিত আর সেকারণেই প্রেসিডেন্ট ধরে নিয়েছিলেন এরা "সৎ সৈনিক

৩ ১৯৬২ সালে ইন্দোনেশীয় সরকার মালয়েশিয়াকে একটি ফেডারেশন করার বৃটেন ও মালয়ের পরিকল্পনার বিরোধিতা করে। এই প্রশ্নে সরকারের নীতি মালয়েশিয়ার সঙ্গে সংঘর্ষ হিসেবে পরিচিত।

রাজনীতির ব্যাপারে এদের কোন সংস্রব নেই।" পদলোভী ঐ ব্যক্তিরা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি, সমৃদ্ধি লাভ এবং সব শেষে রাজনৈতিক জীবনে প্রতিষ্ঠা-লাভ সম্ভব হয় এমন যে কোন ঘটনাকে ব্যবহার করার মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে খুব নিকট থেকেই ঘটনাবলীর অনুসরণ করছিল। যদি পাল্টা চক্রান্তটি সফল হয় তবে সেনাবিভাগের উচ্চতর পদ লাভ সম্পর্কে এরা নিশ্চিত ছিল।

তাহলে ৩০শে সেপ্টেম্বর ও ১লা অক্টোবর ১৯৬৫র রাতে কী ঘটল?

সুকর্ণর জ্ঞাতসারেই প্রেসিডেন্টের দেহরক্ষী রেজিমেন্টের ইউনিটগুলি, কসটাড'(৪) রিজার্ভ বাহিনী এবং নিজস্ব অফিসার দ্বারা পরিচালিত বিমান বাহিনীকে "কাউন্সিলের" সঙ্গে যুক্ত সন্দেহে সৈন্যবাহিনীর সাতজন সর্বোচ্চ পদাভিষিক্ত জেনারেলকে গ্রেপ্তারের আদেশ দেওয়া হয়। এর কিছু আগে কসটার্ডের ৪৫৪ এবং ৫৩০ নং ক্র্যাক ব্যাটেলিয়ান দুটিকে জাকার্তায় আনা হয়। এই অভিযানের সাংকেতিক নাম "সেপ্টেম্বর ৩০-এর অভিযান" (১লা অক্টোবর ভোররাতে এই অভিযানের সূচনা)। এর নেতৃত্ব ছিল প্রেসিডেন্টের দেহরক্ষী রেজিমেন্টের একটি ব্যাটালিয়নের কমাণ্ডার লেঃ কর্নেল উনতুং, এবং কসটার্ড-এর কালিমন্তান ইউনিটের কমাণ্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সুপারজো-র ওপর। সুপারজো-কে জাকার্তায় ডেকে আনা হয়। শেষোক্ত জন জেনারেল সুহার্তোর সরাসরি অধীনস্থ ছিলেন (সুকর্ণর অপসারণের পর যিনি প্রেসিডেন্ট হন)।

তবে প্রেসিডেন্টের আদেশের বিপরীতে জেলে না নিয়ে সাতজন জেনারেলের ছ-জনকেই হত্যা করা হয়। ছ-জনের মৃত্যুর এবং নাসুটিয়ানের পলায়নের সংবাদ পেয়ে প্রেসিডেন্ট বুঝেছিলেন এর পরিণতিতে শুধু প্রতি-ক্রিয়াশীল জেনারেলরাই নয় সমগ্র সৈন্য বাহিনী ক্ষিপ্ত হতে পারে। এই চিন্তা তাঁকে "আন্দোলন" থেকে পিছু হঠে আসতে এবং তদনুযায়ী প্রগতিশীল অফিসারদের সমর্থন অস্বীকার করায় প্ররোচিত করে। ফলে সামরিক বিভাগে পদলোভী ঐ "ব্যক্তিদের" কাছে ক্যু-এর পথ খুলে যায়।

কপকামতিব এই গোষ্ঠীর প্রকৃত ভূমিকাকেই অন্ধকারে রাখতে চায়। "সি-পি আই-র জবাবে" অবশ্য এই "সমরবিভাগে পদলোভী" এই গোষ্ঠীটি

৪ কসটার্ড জেনারেল সুহার্তোর অধীনস্থ সামরিক গুরুত্বপূর্ণ বাহিনী। সুহার্তোর কমিউনিস্ট-বিরোধিতা সুপরিচিত ছিল।

জাতীয় ট্রাজেডির জন্য দায়ী, এরা শীর্ষ স্থানীয় ৬ জন জেনারেলের মৃত্যুর জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী, এ তথ্য প্রমাণের জন্য অকাট্য যুক্তি দেওয়া হয়েছে। প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণে এই "অভিযানে" যোগদানের পরই "সমরবিভাগে পদলোভী" গোষ্ঠীটি ঐ অভিযানের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক ছিন্ন করে (১ লা অক্টোবরের শেষার্ধে) এবং নিজেদের এই লক্ষ্য হাঁসিলের প্রয়াস সুরু করে: সি পি আইকে আঘাত করা, প্রেসিডেন্ট সুকর্ণকে অপসারণ করা এবং ক্ষমতা দখল করা। ছয় জেনারেলের হত্যার ফলে ওদের উচ্চ পদের প্রতিদ্বন্দ্বীরা নিশ্চিহ্ন হয়। "সমরবিভাগে পদলোভী"রা অর্থাৎ সর্বোচ্চ জেনারেলের পরবর্তী ধাপের অফিসাররা এইভাবে "কাউন্সিল অফ জেনারেলস" যে কর্তব্য পালনে ব্রতী হয়েছিল সেই শ্রেণী কর্তব্য পালন করে।

জেনারেলরা ঘটনার যে ভাষ্য দিয়েছিলেন তা কি ভাবে এল তার বিশ্লেষণ করা যাক। এর ফলে কোন্ শ্রেণী এবং রাজনৈতিক স্বার্থকে প্রতিষ্ঠা করা হল তা নির্ধারণে সুবিধা হবে।

১৯৬৫-র শেষ দিকে কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলির প্রাথমিক তদন্তকালে দেখা যায় সমর বিভাগের চেষ্টা ছিল "৩০শে সেপ্টেম্বর-এর আন্দোলন" সি পি আই-এর দ্বারা পরিচালিত ছিল একথা স্বীকার করিয়ে নেওয়া। জেনারেলদের নিয়ন্ত্রিত তদন্তের পেছনে পরিকল্পনা ছিল সমগ্র অভিযানের পরিকল্পনা এবং সংগঠক ছিল সি পি আই কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরো, জনগণকে একথা বিশ্বাস করানো। তদন্তকারীরা এক কানাগলিতে ঢুকে পড়েছিল। ১৯৬৫-র পরবর্তীকালেই সি পি আই কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরোর সদস্য এনজোনো তাঁর তদন্তকারী অফিসারকে বলেছিলেন "সেপ্টেম্বর ৩০-এর আন্দোলন"-এর দরুন ক্ষমতা দখলের বিষয়টি পলিটব্যুরোর পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ছিল না। কিন্তু সামরিক সংবাদপত্রগুলি দেশব্যাপী এই প্রচার করল যে সি পি আই আইনসম্মত সুকর্ণ সরকারের বিরোধিতা করেছে এবং "সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ধাঁচে" একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা তাদের ছিল।

এই প্রচার-হুল্লোড়ের পেছনে একটা রাজনৈতিক হিসাবনিকাশ ছিল। ঐ সময়ে, তখনও সুকর্ণর নাম আবরণ হিসেবে ব্যবহার করতে হলেও জেনারেলরা তাঁর কর্তৃত্ব অস্বীকার করে এক নজিরহীন কমিউনিস্ট বিরোধী

অভিযান সুরু করে। ওরা কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে হাজার হাজার উগ্র মুসলিমদের, ভুস্পেন প্রলেতারিয়েত এবং সামাজিক বিভাগের প্রচার বিভ্রান্ত জনতাকে লেলিয়ে দেওয়ার জন্য সি পি আই সম্পর্কে "সেপ্টেম্বর ৩০-এর আন্দোলন" সম্পর্কিত সাজানো গালগল্প ব্যবহার করে। সমগ্র ইন্দোনেশিয়া জুড়ে সমর বিভাগ হত্যাকারীর দল তৈরি করে, তাদের ঐ ধিক্কারজনক কাজের জন্য দিন দুই তিনের প্রশিক্ষণ দেয় আর তারপরে কমিউনিস্টদের খুঁজে বের করে হত্যার জন্য ছেড়ে দেয়। এই ভাবেই জেনারেলদের বানানো "৩০শে সেপ্টেম্বরের আন্দোলনের" ভাষ্য কমিউনিস্ট এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে শারীরিকভাবেও সম্পূর্ণত ধ্বংসের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেয়।

কমিউনিস্ট পার্টি নিশ্চিহ্ন হওয়ার পর সামরিক পদস্থ কর্তাব্যক্তির দল যারা প্রেসিডেন্ট সুকর্ণর প্রতি আনুগত্যের শপথ নিয়েছিল, তারা সুকর্ণর সঙ্গে বোঝা-পড়ার জন্য প্রস্তুত হয়। এবারে তদন্তকারীদের নতুন এক দায়িত্ব দেওয়া হল ; "সেপ্টেম্বর ৩০-এর ঘটনাবলী" সম্পর্কে কমিউনিস্ট-বিরোধী ব্যাখ্যা প্রধান বিষয় থাকলেও সুকর্ণর যোগসাজশ ছিল কিনা তা অনুসন্ধান করার নির্দেশ এল। সমরবিভাগ দৃঢ়ভাবে তাঁকে অপদস্থ এবং ভীতি প্রদর্শন করছিল। কারণ, তখনও তাদের ভয় ছিল যে প্রকৃত ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের জন্য সুকর্ণের অব্যাহত প্রয়াস তাঁর অবশিষ্ট সমর্থকদের জড়ো করতে পারে। ১৯৬৫ থেকে এক চুপিসার ক্যু-এ লিপ্ত থাকতে থাকতে ওরা অবশেষে নাটকের চূড়ান্ত অঙ্কের জন্য—সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রেসিডেন্টের অপসারণের জন্য—তৈরি হল। ১৯৬৭-এর মার্চ-এ ঠিক এটাই ঘটেছিল।

কপকামতিব-এর ভাড়াটে দলিল লেখকরা সি পি আই কেন্দ্রীয় কমিটির নিহত চেয়ারম্যান ডি এন আইদিতকে ঐ "অভিযানের" সর্বোচ্চ নেতা বলতেও কসুর করে নি। ওরা জোর দিয়ে প্রমাণের চেষ্টা করেছে সি পি আই নেতৃত্বের প্রেসিডেন্ট সুকর্ণর বিরোধিতার লক্ষ্য ছিল তাঁকে অপসারিত করে ক্ষমতা দখল করা।

কিন্তু যে প্রশ্নটা সঙ্গতভাবেই দেখা দেয় : সি পি আই নেতৃত্ব যদি প্রকৃতই ঘটনাবলীর গতিপথ পরিচালিত করে থাকে তবে "সেপ্টেম্বর ৩০-এর অভিযানে" লিপ্ত সামরিক ইউনিটগুলিকে, কমিউনিস্ট-বিরোধী সৈন্য দলকে এবং সুকর্ণর প্রতি অনুগত দেহরক্ষী বাহিনীকে পরিচালিত করল কে ? তাছাড়া, সি পি

আই-এর পক্ষে কি ভাবেই বা ঐ পাঁচমিশেলী শক্তির কার্যকলাপের সমন্বয় সাধন সম্ভব হয়েছিল ? কপকামন্ডিবের সব বানানো কাহিনীই স্ববিরোধিতার পূর্ণ : ওদের কথা বিশ্বাস করতে হলে মেনে নিতে হয় যে কমিউনিস্টরা সেই সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছিল যারা তাদের অধীনস্থ নয় কিংবা পার্টি সূত্রে যারা কোন বন্ধনেই আবদ্ধ ছিল না।

শ্বেতপত্রের দলিল লেখকরা ঐ ঘটনাবলীতে প্রেসিডেন্ট সুকর্ণর ভূমিকা সম্পর্কে একটা বিশ্বাসযোগ্য গল্প আবিষ্কারের যে প্রয়াস করেছেন তা-ও ব্যর্থ হয়েছে। তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে এক অসংলগ্ন চিত্র দেওয়া হয়েছে। সুকর্ণকে চিত্রিত করা হয়েছে এক উদ্ধত প্রেসিডেন্ট হিসেবে, যিনি চক্রান্তকারী সেনা-নায়কদের বিরুদ্ধে "ব্যবস্থা গ্রহণের" জন্য তাঁর দেহরক্ষীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন ; এক বিভ্রান্ত, ভীত সন্ত্রস্ত এবং অসহায় মানুষ হিসেবে ; এবং সি পি আই-এর ইচ্ছা কার্যকর করার এক অনুগত ব্যক্তি হিসেবে। শেষোক্ত অভিমতটি শ্বেতপত্রে বিশেষ জোরের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্টদের প্রসঙ্গে আমরা স্বীকার করছি, ১৯৬৫-র শরৎকালের সেই গুরুতর পরিস্থিতির সময় কোন কোন সি পি আই নেতা প্রতিক্রিয়ার আঘাতকে সফলভাবে প্রতিহত করার, আমি জেনারেলদের দক্ষিণপন্থী চক্রান্তকারী অংশটি যে প্রতিবিপ্লবী ক্যু-এর পরিকল্পনা করে, তার বিরুদ্ধে সংগ্রামে উপযুক্ত পদ্ধতি গ্রহণ করে নি। বিপ্লবকে রক্ষার জন্য পার্টি এবং মেহনতী মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান দেওয়ার পরিবর্তে ডি. এন. আইদিত এবং কার্যনির্বাহী কমিটিতে আরও কয়েকজন সহকর্মী প্রেসিডেন্ট সুকর্ণর পরিকল্পনা সমর্থনের মধ্যেই পার্টির কার্যকলাপকে সীমিত রাখেন। কার্যত সি পি আই-এর ৩০ লক্ষ সদস্য এই ঘটনায় কোন অংশই কোন ভূমিকা গ্রহণ করে নি। এমন কি ১লা অক্টোবরের পরও সি পি আই নেতৃত্ব পার্টিকে আহ্বান জানানোর পরিবর্তে "রাজনৈতিক মীমাংসার দায়িত্ব প্রেসিডেন্ট সুকর্ণর হাতে ছেড়ে দেওয়ার" আবেদন জানায়। ফলে, সি পি আই নেতৃত্ব, সুকর্ণর পেটিবুর্জোয়া সংকীর্ণতার উর্ধে উঠতে ব্যর্থ হয়। এটা আকস্মিক ছিল না। এ হল মাওবাদী আদর্শের ক্ষতিকারক প্রভাব যা তখনই সি পি আইতে প্রবেশ করেছিল। পার্টি ও জনগণের প্রতি মাওবাদের অবিশ্বাস এবং শ্রম-জীবী মানুষের ভ্যানগার্ড হিসেবে পার্টির ভূমিকাকে নস্যাৎ করার দৃষ্টিভঙ্গি

ইন্দোনেশিয়ায় যুক্তিসঙ্গত পূর্ণতা পায়। এরই পরিণতি দাঁড়ায় নিরংকুশ ক্ষমতায় উচ্চকোটির কর্মকাণ্ডের প্রতি সমর্থনে এবং প্রাসাদ রক্ষীর সহায়তায় দেশের সমস্যার মীমাংসার প্রয়াসে মাও-র প্রতিবিপ্লবী, জনবিরোধী ধারণাগুলিকে পথপ্রদর্শক গণ্য করায় সি পি আই নেতৃত্বে প্রতিক্রিয়াশীলদের হটিয়ে দেওয়ার জন্য পার্টি ও শ্রমজীবী মানুষকে সমবেত করতে সক্ষম হয় নি।

অপরাধ গোপন করার জন্য প্রতিক্রিয়াশীলরা ১৯৬৫-র ৩০শে সেপ্টেম্বরের ঘটনাবলীর প্রকৃত তথ্য জানত এমন বহু লোককে খুন করে। কোনরকম বিচার বা তদন্ত ছাড়াই তারা সি পি আই কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান ডি এন আইদিত, তাঁর সহকারী লুকমান এবং নোটো ও পলিট ব্যুরো সদস্য সাকিরমানকে খুন করে। এদের মধ্যে ছিলেন জেনারেল সুপারজো যাঁর সাক্ষ্য কর্তৃপক্ষের বানানো কাহিনীর বিরোধী ছিল। তাঁকেও হত্যা করা হয়।

কিন্তু একটা মিথ্যাকে হাজার বার আওড়ালেই কি তা সত্য হবে? ঐ ঘটনা সম্পর্কে জেনারেলদের উক্তি এমন অনেক প্রশ্নের উদ্রেক করে, কোনো সৎ এবং নিরপেক্ষ ব্যক্তিই যার উত্তর দাবি করতে পারেন। পূর্বেই উল্লেখ করেছি কপকামতিবের জবাবে ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি প্রাঞ্জলভাবেই তা করেছে। গোয়েন্দা পুলিসের হস্তক্ষেপে খাড়া করা দলিলপত্র এবং তথ্যাবলী যে "নয়া ব্যবস্থার(৫) পণ্ডিতদের উদ্দেশ্য হাঁসিলে ব্যর্থ হয়েছে তার প্রমাণ শ্বেতপত্রটির প্রচার তড়িঘড়ি বন্ধ করে দেওয়া। বস্তুত, সেই সিয়ার নির্দেশেই এটা করা হয়েছে যাদের সঙ্গে সমর বিভাগের উচ্চ কোটির অফিসারদের দীর্ঘদিনের যোগাযোগ। রাজনৈতিক প্ররোচনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যাপক প্রচারের এই প্রয়াস শোচনীয় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

৫ সুকর্ণর "পুরোনো ব্যবস্থার" সঙ্গে পার্থক্য বোঝানোর জন্য বর্তমান প্রশাসনের সরকারী প্রচার বিশারদরা শব্দটি চালু করেছেন।

শ্রমিকদের "অংশগ্রহণ" প্রসঙ্গে কমিউনিস্ট অভিমত

আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্র

পুঁজিবাদী দেশগুলিতে উৎপাদন পরিচালনার ক্ষেত্রে শ্রমিকদের অংশগ্রহণ এবং এই সমস্যা সম্পর্কে কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গীর উপর একটি আলোচনা চক্র অনুষ্ঠানের প্রস্তাব করেছিলেন প্রাগ সম্মেলনে উপস্থিত জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি ও গ্রেট ব্রিটেন কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিবৃন্দ। এই সম্মেলনে আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল: একটি বিপ্লবের ক্ষেত্রে অর্থনীতি ও রাজনীতির ডায়ালেকটিকস।* শ্রমিকদের "অংশগ্রহণ" ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত প্রশ্ন সম্পর্কে কোন কোন দেশে কমিউনিস্টদের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তার ফলেই প্রতিনিধিরা এই আলোচনা চক্রের প্রস্তাব দেন। ট্রেড ইউনিয়নগুলিও এই বিষয় সম্পর্কে একমত নয়। বিশেষ করে ইউরোপীয় দেশগুলিতে "অংশগ্রহণের" বিভিন্ন পদ্ধতি সম্প্রতি কালে ব্যাপকতা লাভ করেছে; তাই এই সমস্যা অধিকতর জরুরী বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ডবলু এম আর এবং বোর্ড অব জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির যুগ্ম উদ্যোগে এই আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয় পশ্চিম জার্মানীতে ১৯৭৯ সালের ১৩ ও ১৪ ডিসেম্বর। যে নয়টি দেশের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিরা এই সম্মেলনে যোগ দেন সে দেশগুলি হল: বেলজিয়াম, ব্রিটেন, চিলি, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী, লুক্সেমবুর্গ, পর্তুগাল এবং সুইডেন। প্রথম দুই বক্তা (আলোচনা চক্রের উদ্যোগী জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি ও গ্রেট ব্রিটেন কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে) যে মত ব্যাখ্যা করেন তা মৌলিক দিক দিয়ে এক হলেও কতকগুলি বিষয়ে ভিন্ন। উভয় বক্তার রচনাই এখানে প্রকাশিত

---

* প্রাগ সম্মেলনের বিবরণ পাওয়া যাবে ডবলু এম আর-এর মার্চ, মে, জুন (১৯৭৮) সংখ্যাগুলিতে।

হল। এই আলোচনায় সমস্ত প্রতিনিধিরাই অংশগ্রহণ করেন—আলোচনার মাধ্যমে এই প্রশ্নটির উপর পরস্পরের বোঝাপড়া সহজতর হয় এবং বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী কাছাকাছি আসে এবং এই আলোচনার মাধ্যমে একটি অর্থপূর্ণ সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হয়। এই আলোচনা সম্পর্কিত একটি সমীক্ষা আমাদের পত্রিকার যে কোনো একটি সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ এবং নিয়ন্ত্রণ শ্রমিকদের ঃ একটি শ্রেণীগত দাবি

লুডভিগ মুলার
সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য, জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি
বোর্ডের সম্পাদক

উৎপাদন পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের এবং শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম পশ্চিম জার্মানীতে (এফ আর জি) সংগ্রামের একটি বৃহত্তর ক্ষেত্র—যাতে করে এই সংগ্রামের মাধ্যমে কারখানা ও কোম্পানীস্তরে শ্রমিকশ্রেণীর তার প্রতিনিধি ও সংগঠনগুলির গণতান্ত্রিক ও সামাজিক অধিকার রক্ষা করা, সংহত ও সম্প্রসারিত করা যায়। এটা অর্থ-নৈতিক নীতিকেও প্রভাবিত করে।

শ্রমজীবী মানুষ সামাজিক জীবনের বিভিন্ন দিকেও যেমন, উচ্চতর শিক্ষা এবং পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে নিজেদের বক্তব্য রাখার জন্য ক্রমবর্ধমান চাপ সৃষ্টি করছে তা থেকে এটা সুস্পষ্টভাবেই বোঝা যায় যে এফ আর জি-তে স্বৈরতান্ত্রিক-শাসন ও দক্ষিণমুখী মোড়ের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান গতিতে এক ব্যাপক গণতান্ত্রিক বিরোধিতা গড়ে উঠছে।

আমাদের পার্টির কর্মসূচীতে বলা হয়েছে যে সংগ্রামের এই উভয় দিকগুলি এই অর্থে বিপুল তাৎপর্যপূর্ণ যে তারা এমন একটি বলিষ্ঠ গণতান্ত্রিক শক্তির পক্ষে অনুকূল মতাদর্শগত ও সাংগঠনিক ভিত্তির সূচনা করছে যার লক্ষ্য হল

সামাজিক ও গণতান্ত্রিক অগ্রগতির পথে মোড় নেওয়া, একচেটিয়া বিরোধী গণতন্ত্র অর্জন করা এবং আমাদের দেশে একটি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পথ উন্মুক্ত করা।

পশ্চিম জার্মানীতে শিল্পসংস্থাগুলির শ্রমিকদের অংশগ্রহণ সংক্রান্ত সমস্ত দাবিগুলিতে যে বিষয়টি ব্যবস্থাপনায় বৈশিষ্ট্যসূচক ও কেন্দ্রীয় তা হল মার্ক্সের ভাষায় শ্রমিকশ্রেণীর অর্থনীতি, যথা, সামাজিক জ্ঞান ও দূরদৃষ্টির ভিত্তিতে সামাজিক উৎপাদনের উপর নিয়ন্ত্রণ এবং তার ব্যবস্থাপনা।* বর্তমানে বিচার্য বিষয়টি হল কাজের অবস্থা, উৎপাদন, বন্টন এবং রাষ্ট্রীয় পুঁজি নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করা অর্থাৎ পুঁজিবাদের একচ্ছত্র ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে বিরামহীন শ্রেণীসংগ্রামের ও অন্যান্য কাজ পরিচালনা যাতে করে এ ধরনের অংশ গ্রহণের দাবি আদায় করা যায়।

এক বিশেষ পরিস্থিতির মধ্যে এই সংগ্রাম চলছে। পশ্চিম জার্মানীতে গত কয়েক বছর পুঁজিবাদের সর্বাত্মক সংকটের তীব্রতা দেখা দিয়েছে এবং শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে এই সংকটের ফলে উদ্ভূত তিক্ততাও বৃদ্ধি হয়েছে। এর ফলে ব্যবস্থাপনায় গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ এবং শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের গুরুত্ব বিপুলভাবে বৃদ্ধি লাভ করেছে।

সাধারণ সংকটের গভীরতা, প্রধান সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যে ক্রমবর্ধমান বিরোধ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা, পুঁজিবাদের স্বার্থের প্রতিকূল আন্তর্জাতিক শক্তির ভারসাম্যের প্রতিনিয়ত পরিবর্তন প্রভৃতি কতক পরিমাণে পশ্চিম জার্মানীতে বৃহৎ পুঁজির সম্ভাবনাকে সীমিত করছে। এই ক্রমবর্ধমান অসুবিধাগুলি থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য অথবা তা হ্রাস করতে বৃহৎ পুঁজির কর্মনীতির প্রধান দিকটি হল তার নিজের দেশের শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে এবং শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক ইতিপূর্বেই অর্জিত সামাজিক ও গণতান্ত্রিক অধিকারগুলোর উপর আক্রমণ চালিয়ে যাওয়া। এই আক্রমণ সর্বদিকে চালানো হচ্ছে—এই আক্রমণের প্রতিক্রিয়া শুধু অর্থনীতি, কারখানা, কোম্পানী এবং সমগ্র শিল্পের ক্ষেত্রেই ঘটে নি এই আক্রমণ গুরুতর রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত সংঘর্ষের

* কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস (তিন খণ্ডে) সিলেক্টেড ওয়ার্কস, খণ্ড ২য়, ১৬ পৃষ্ঠা।

পথে ঠেলে নিয়ে যায় এবং তা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

বৃহৎ পুঁজির সাধারণ কর্মনীতির মধ্যে তিনটি প্রধান কর্মপন্থার ব্যবস্থা রয়েছে—এই তিনটি কর্মপন্থার মাধ্যমে বৃহৎ পুঁজিপতিরা শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের বিনিময়ে নিজেদের অনুকূলে মৌলিক ও দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের নিশ্চয়তা বিধানের প্রয়াস চলাচ্ছে।

প্রথমত : বৃহৎ পুঁজির অনুকূলে বন্টনের শর্তে এবং বন্টনকৃত পণ্যের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি পরিবর্তন। এই উদ্দেশ্যে ব্যবসায়ীদের সংস্থা "বিপরীতমুখী বন্টন" নামে একটি শব্দও আবিষ্কার করে। শেষ পর্যন্ত এর অর্থ দাঁড়ায় : কারখানা ও অফিস কর্মীরা যে পণ্যাদি উৎপাদন করে (ব্যক্তিগত ও সামাজিক ভোগের ক্ষেত্রে) তার উপর তাদের অংশ হ্রাস করা।

দ্বিতীয়ত : প্রধান লক্ষ্যবস্তুটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত বিদ্যার অগ্রগতির সঙ্গে যুক্ত অর্থাৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে জোরদার র‍্যাশনালাইজেশন এবং পুঁজিবাদী পদ্ধতিতে নতুন প্রযুক্তিবিদ্যা কাজে লাগানো। যখন শ্রম উৎপাদিকার ক্ষেত্রে বিপুল বৃদ্ধি আংশিকভাবে অর্জিত হয়েছে তখন পুঁজির মালিকেরা এর ফলাফলগুলিকে অবাধে কাজে লাগানোর চেষ্টা করে। উৎপাদনের উপায়ের উপর একচেটিয়া অধিকার থাকায় তারা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রকে ব্যবহার করছে—যাতে করে নতুন প্রযুক্তিবিদ্যা প্রধানত অর্থনীতি ও সরকারের মধ্যে তাদের অবস্থান সংহত করার যে সুযোগ এনে দিয়েছে তাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে রাখার ব্যবস্থা করা যায়। কিন্তু একই সঙ্গে সমস্ত জনসংখ্যার জীবনধারণের অবস্থা উন্নত করারও যে সুযোগ রয়েছে সে সম্পর্কে তারা চোখ বুজে থাকে। পুঁজির মালিকদের এই পথ শ্রমজীবী মানুষকে আঘাত করছে। কারণ এটা প্রতিশ্রুত কর্ম সংস্থানের সংখ্যা হ্রাস করে, বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত গোষ্ঠীগুলিকে তছনছ করে দেয়, দক্ষতার মান ও মজুরির হার কমিয়ে দেয় এবং শ্রমকে দুর্বল করে ফেলে ও শ্রমের তীব্রতা বাড়ায়।

এর সঙ্গে চলতে থাকে বৃহৎ পুঁজিপতিদের এমন প্রয়াস যাতে করে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী সাফল্যগুলির ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপর শ্রমিকশ্রেণী ও তার সংগঠনগুলির প্রভাব খর্ব করা যায়। এ প্রসঙ্গে সমস্ত ধরনের নিয়ন্ত্রণ এবং সেই সঙ্গে উৎপাদনের ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণের কাজ

সম্প্রসারিত করার ও বিশেষ করে মালিকানা সম্পত্তি সংক্রান্ত সম্পর্ক পরিবর্তনের প্রচেষ্টার কথা রয়েছে।

এফ আর জিতে (পশ্চিম জার্মানী) একচেটিয়া পুঁজির প্রধান লক্ষ্যবস্তু হল শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী সম্ভাবনাকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে সঙ্কুচিত করা এবং কমিউনিজম-বিরোধিতাকে তীব্রতর করে তুলে, লক আউট এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলির উপর ক্রমবর্ধমান চাপ সৃষ্টি করার অন্যান্য পন্থা অনুসরণ করে শ্রমিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীনতা খর্ব করা এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে মালিকদের মুনাফালুটের ব্যবস্থা পাকা করার উপাদানে পরিণত করার লক্ষ্য নিয়ে নতুন ধরনের "সামাজিক অংশগ্রহণ" সংক্রান্ত মতাদর্শ স্থির করাও হল একচেটিয়া পুঁজির তৃতীয় প্রধান লক্ষ্যবস্তুর অন্যতম।

ব্যবস্থাপনায় গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের এবং শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণের জন্য সংগ্রাম তাই এফ আর জিতে সংগ্রামের তিনটি ক্ষেত্রেই ট্রেড ইউনিয়নের এবং শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক আন্দোলনের রণনীতির মোক্ষম উপাদান। তাই বর্তমানে এটা আমাদের শ্রমিকশ্রেণীর অত্যন্ত জোরদার সামাজিক অর্থনৈতিক দাবি।

আমরা কমিউনিস্টরা ভুলতে পারি না যে এই সংগ্রামের একটি ইতিহাস রয়েছে। এফ আর জি-তে ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণের দাবি শুধুমাত্র ১৯৬০ অথবা ১৯৭০ দশকেই উচ্চারিত হয় নি। এই দাবি হল পুঁজিবাদী অর্থনীতির উপর, বিশেষ করে উৎপাদনের ক্ষেত্রে কারখানা ও অফিস কর্মীদের এবং তাদের সংগঠনের গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের জন্য সাধারণ দাবির প্রতিফলন—এই প্রতিফলন হল আজকের দিনে শক্তিবিন্যাস, ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা ও আমাদের দেশে সংগ্রামের পরিস্থিতির প্রতিফলন।

এটা স্মরণ করা যেতে পারে যে মার্কস ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের তাৎপর্য সম্পর্কে যে কথা উল্লেখ করেন তা হল: এই সংগঠন শ্রমের বাজারের উপর শুধু শ্রমিকদের প্রতিযোগিতাকেই বন্ধ করে না—এই সংগঠন পুঁজির বিরুদ্ধে শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করে একটি শক্তিতে পরিণত হয় যা শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বাস্তবভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। গোড়া থেকেই এটা ছিল পুঁজিবাদের স্বৈরাচারী শাসন ও বর্বরতার বিরুদ্ধে একটি সংগ্রাম। এই সংগ্রামের মাধ্যমেই শ্রমিকশ্রেণী তার গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগে সমর্থ

হয়। এর মধ্যে যুক্ত রয়েছে যেমনি প্রত্যক্ষ সংগ্রাম যার লক্ষ হল পুঁজির নিজ নিজ ব্যবস্থা সংশোধন বা খর্ব করা এবং তেমনি মজুরি হারের জন্য সংগ্রাম অর্থাৎ শ্রম ও পুঁজি, শ্রমিক ও পুঁজিবাদী এবং ট্রেড ইউনিয়ন ও পুঁজিবাদী সংস্থা প্রভৃতির মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটা চুক্তিবদ্ধ ব্যবস্থা। সমগ্রভাবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা রক্ষার উদ্দেশ্যে পুঁজি অর্জনের সাধারণ পরিস্থিতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান হস্তক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে, পুঁজিবাদী-শিল্প সম্পর্কের সহজাত স্বৈরাচারীতার সঙ্গে সঙ্গে এবং রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের উপর উৎপাদনের সাধারণভাবে আরও বেশি বেশি নির্ভরশীলতার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর অধিকারের আইনসঙ্গত আনুষ্ঠানিকতা লাভের জন্য সংগ্রাম ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব লাভ করছে। ব্রিটিশ শ্রমিকশ্রেণীর দশ ঘন্টা কাজের সময় অর্জন করা, অর্থাৎ এই প্রথম কাজের ঘন্টা আইনগতভাবে সীমিতকরণকে মার্কস "একটি নীতির জয়" বলে অভিহিত করেছেন।*

এই অভিজ্ঞতাই হল পুঁজিবাদী ক্ষমতাকে সীমিত করা ও তাকে জয় করার একটি পদ্ধতি ও হাতিয়ার হিসাবে শ্রমিকদের গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত লেনিনের ধ্যান-ধারণার ভিত্তি।

জার্মানীতে ১৯১৮ সালের বিপ্লবের মধ্যে এবং পরবর্তী সংগ্রামে, শ্রমিক ও তাদের সংগঠনগুলির নেতৃত্বে পরিচালিত তাদের অধিকার ও প্রভাব বিস্তারের জন্য শ্রেণী-সংগ্রামের একটি বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ উপাদান ছিল ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ ও অংশগ্রহণের জন্য সংগ্রাম। এই সংগ্রাম সোভিয়েত প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের এবং সমাজতন্ত্রীকরণের দাবির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। বিপ্লবের পরাজয়ের পর এবং পরিবর্তিত শক্তি-বিন্যাসের ফলে শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য জঙ্গী সংগ্রামে উৎপাদনের উপর সর্বব্যাপক ও কার্যকর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম প্রতিফলিত হয়, এবং প্রধানত এই সংগ্রাম অর্জিত অধিকার রক্ষার সংগ্রাম।

১৯৪৫ সালের পর সমাজতন্ত্রীকরণ এবং ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণের দাবি প্রকৃতপক্ষে সমস্ত নীতিগত বিবৃতিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর কারণ: জনসাধারণ এটা উপলব্ধি করেছিল যে ফ্যাসিবাদীদের ক্ষমতাসীন হওয়া এবং যুদ্ধ

* পূর্বোক্ত গ্রন্থ।

বাধানোর জন্য দায়ী ছিল বৃহৎ পুঁজিপতিরা। সে সময় শ্রমিকদের সংগঠনের পক্ষে যে বিবৃতি প্রচারিত হয়েছিল তাতে শিল্প সংস্থা পরিচালনায় অংশ-গ্রহণের দাবি উত্থাপিত হয়—এ দাবি সমাজতন্ত্রীকরণের বিকল্প হিসাবে উত্থাপিত হয় নি—এ দাবি উত্থাপিত হয় একটি বিশেষ বিষয়বস্তু হিসাবে এবং তাতে শ্রমিকদের শিল্পসংস্থায় প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ও অংশগ্রহণের কথা উল্লিখিত থাকে। যুদ্ধের পর প্রথম বছরে পশ্চিম জার্মান ল্যাণ্ডার, বিশেষ করে ব্রেমেন এবং হেসেন-এ খনি, ধাতু এবং অন্যান্য শিল্পে যৌথ সংস্থা ও ট্রেড ইউনিয়নগুলি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের অধিকার অর্জন করে। ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের আন্দোলনের সঙ্গে প্রতিযোগিতার ভয়ে শিল্পসংস্থা ভেঙে দেওয়ার বিরুদ্ধে কর্মপন্থা এবং খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নয়নের কাজ যুক্ত হয়।

কিন্তু যখন বৃহৎ পুঁজি তার শক্তি পুনরুদ্ধার করে, তখন পাল্টা আক্রমণ চালাতে থাকে। যখন এফ আর জি প্রতিষ্ঠিত হল এবং তার সংবিধান ঘোষিত হল তখন শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক অর্জিত গণতান্ত্রিক অধিকারগুলির বিরুদ্ধে চতুর্দিক থেকে আক্রমণ শুরু হয়। ট্রেড ইউনিয়নগুলি শিল্পসংস্থার অবস্থান বা মর্যাদা সম্পর্কে আইন প্রণয়নের দাবি করে এই আক্রমণের জবাব দেয়। এর পরে যে আইন বিধিবদ্ধ হয় তার মধ্যে চিহ্নিত ছিল অখণ্ড "সামাজিক অংশীদারত্বে"-র কথা। ১৯৬০ দশকের মধ্যভাগ থেকে শুরু করে, বিশেষ করে পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটের তীব্রতার ফলে, সমস্ত সামাজিক সমস্যা আরও বেশি গুরুতরভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ থেকেই উৎপাদন-ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণের জন্য শ্রমিকদের শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গিমুখী দাবির সত্যতা ক্রমশই প্রমাণিত হচ্ছে।

তাই ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণের দাবি পশ্চিম জার্মান শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে দৃঢ়ভিত্তিক একটি শ্রেণী দাবি: এই দাবি গণতান্ত্রিক অধিকার বিস্তারের লক্ষ্যবস্তুর সঙ্গে যুক্ত এবং একে ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগত-অংশ গ্রহণের মধ্যে অর্থাৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির আইন-কানুন সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা চলতে পারে না। ব্যবস্থাপনায় গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ হল সর্বস্তরে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও মতাদর্শ প্রভৃতি সমস্ত ধরনের শ্রেণীসংগ্রামের লক্ষ্য। এ ধরনের অংশগ্রহণের দাবির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে

কতদূর পর্যন্ত সেটা প্রয়োগ করা যেতে পারে তা নির্ভর করে শ্রম ও পুঁজির মধ্যে শক্তির প্রকৃত ভারসাম্যের উপর, এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে তা ক্ষমতার প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত হয়।

শ্রেণীসংগ্রামের তীব্রতার সঙ্গে সঙ্গে এবং শ্রমিকদের শ্রেণী সচেতনতার গভীরতা বৃদ্ধির সঙ্গে এই সংগ্রাম প্রকাশ্যভাবে, শ্রমিকদের গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের দাবিতে আত্মপ্রকাশ করে। বর্তমানে ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণের দাবি হল শ্রমিকদের দ্বারা গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের জন্য এক ব্যাপকতর ও আরও বেশি সুদূরপ্রসারী দাবির একটি বিশেষ সীমিত ধরন। কিন্তু সর্বোপরি ইতিপূর্বেই যা কিছু অর্জিত হয়েছে তা হল শ্রমিকদের শ্রেণীসংগ্রামের ফল। পুঁজিবাদীরা স্বেচ্ছায় কখনও তাদের ক্ষমতার একবিন্দুও ত্যাগ করবে না।

কমিউনিস্টরা উপলব্ধি করে যে যদি ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণের দাবি শ্রমিকশ্রেণীর একচেটিয়া-বিরোধী রণনীতির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়, যদি তারা পুঁজিবাদী সমাজের সর্বশেষ স্তরের সামাজিক ভিত্তি উপেক্ষা করে তবে মতাদর্শগত এবং বাস্তব অর্থে একচেটিয়া পুঁজির শ্রেণী সংযোতা ও শ্রেণী-সংহতির নীতির শুরুতেই অধঃপতন ঘটতে পারে, এবং তার উদ্দেশ্য হল গণতান্ত্রিক অধিকার বানচাল করা এবং 'শ্রমিকশ্রেণী ও তার সংগঠনের কণ্ঠরোধ করা।

উৎপাদন ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ এবং শ্রমিকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ প্রথম থেকেই জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচী ও নীতির লক্ষ্যবস্তুর মধ্যে উল্লিখিত রয়েছে। আমরা জানি যে শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গীর অর্থ হল "সামাজিক অংশীদারিত্বে"র পথে যে কোন বিকৃতির কঠোর বিরোধিতা করা।

পশ্চিম জার্মানীর বর্তমান পরিস্থিতিতে জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি ব্যবস্থা-পনায় অংশগ্রহণকে শ্রমিকশ্রেণীর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ স্বার্থ ও সাফল্যের মধ্যে এবং দৈনন্দিন ঘটনা সমাজব্যবস্থার সমস্যাবলীর মধ্যে ঐতিহাসিকভাবে এক নির্দিষ্ট সংযোগ হিসাবে গণ্য করে।

আমরা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ঐতিহাসিক-ভাবে অনিবার্য অবসানের প্রতিকল্প বা বদল হিসাবে মনে করি না, আমরা এই অংশগ্রহণকে সামাজিক ও গণতান্ত্রিক অগ্রগতির দিকে মোড় নেয়ার এবং

রাষ্ট্র ও সমাজের গণতান্ত্রিক নবীকরণের সংগ্রামের অচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে মনে করি এবং আমরা উপলব্ধি করি যে এ সংগ্রাম আমাদের এই লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক। ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণের সংগ্রাম যে কোন সামাজিক পরিবর্তন আনার এবং শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তি সমর্থিত এক-চেটিয়া-বিরোধী রাষ্ট্র ক্ষমতার জন্য অবস্থা সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা থেকে অভিন্ন অর্থাৎ এ প্রয়াস হল রাজনৈতিক শক্তির ভারসাম্যে এক মৌলিক পরিবর্তন। আমাদের মতে, ব্যবস্থাপনায় ও নিয়ন্ত্রণে অংশগ্রহণের জন্য সংগ্রাম অন্যান্য একচেটিয়া-বিরোধী সংস্কারের জন্য অভিযানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত— সংস্কারের দাবিতে এই অভিযানগুলি হল: কাঁচা মাল, অন্যান্য মূল শিল্প, বাজার-নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা, ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী, একচেটিয়া সংবাদপত্র মালিকানা এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি জাতীয়করণ এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য সংস্কার।

অংশ গ্রহণের জন্য সংগ্রাম কোনক্রমেই রাষ্ট্রীয় সংস্থা এবং আইনকানুনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। এমনকি যেখানে ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ আইনসঙ্গতভাবে বিধিবদ্ধ সেখানেও শ্রমিকরা এবং তাদের ট্রেড ইউনিয়ন-গুলি তাদের প্রচেষ্টা কিছুতেই শিথিল করতে পারে না যে পর্যন্ত না তারা নিশ্চিন্ত হতে পারছে যে এই আইনগত অধিকারগুলি শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থে কার্যকর করা হচ্ছে। তাই আমরা কমিউনিস্টরা ব্যবস্থাপনায় অংশ গ্রহণের পক্ষে আইনগত ধারাগুলির সর্বাধিক ব্যবহারের উপর জোর দিয়ে থাকি, আমরা এই আইনের আরও বিশেষভাবে সম্প্রসারণের দাবি করি। আবার সেই সঙ্গে আমরা মালিকদের স্বেচ্ছাচারী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে শ্রমিক ও ট্রেড ইউনিয়নগুলির দৈনন্দিন প্রতিবাদ আন্দোলনকে সমর্থন করি। তদারকী বোর্ডগুলি শ্রেণীসংগ্রামের স্থান পূরণ করতে পারে না (যদিও এটা মালিকদের কাম্য)। তারা এই সংগ্রামের পূরক হিসাবে কাজ করে এবং এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। অংশগ্রহণকারী সংস্থায় কমিউনিস্টরা কখনও "সামাজিক অংশীদার" হিসাবে কাজ করে না। তারা শ্রমিকদের অধিকার ও স্বার্থের জন্য সংগ্রাম করে। এটাও শ্রম ও পুঁজির মধ্যে বিরোধী শক্তির দ্বন্দ্ব। প্রয়োজন অনুসারে সংগ্রাম সীমা অতিক্রম করে যায় এবং তাকে ট্রেড ইউনিয়ন এবং সমস্ত শ্রমজীবী মানুষ কার্যকরভাবে

সমর্থন করে। উপরন্তু, আমরা উৎপাদন ও মজুরিহার সংক্রান্ত চুক্তিগুলিকে শিল্পসংস্থা পরিচালনার জন্য অধিকার প্রয়োগের উপায় হিসাবে ব্যবহার করার আহ্বান জানাই।

ব্যবস্থাপনায় গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ এবং শ্রমিকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের কয়েকটি বর্তমান গুরুত্বপূর্ণ ধারা ও লক্ষ্যবস্তু সম্পর্কে আমরা সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করছি:

প্রথমত, শ্রমিকশ্রেণী ও তার ইউনিয়নগুলির সংগ্রামের জন্য অত্যাবশ্যক মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীনতার গ্যারান্টি এবং সম্প্রসারণ। এর মধ্যে যুক্ত আছে মজুরির হার সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার অধিকার, ধর্মঘটের অধিকার, লক-আউটের বিরুদ্ধে আন্দোলন, ধর্মঘটীদের অপরাধী হিসাবে তালিকাভুক্ত করার ও তাদের উপর গোয়েন্দাগিরির বিরুদ্ধে কর্মপন্থা, মোর্চা গঠনের স্বাধীনতা, আইন করে ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে আয়ত্তে রাখার সমস্ত অপচেষ্টাকে বানচাল করার আন্দোলন ইত্যাদি। এর জন্য প্রয়োজন শ্রমিকশ্রেণীকে সংগঠিত করতে সক্ষম এমন শক্তি হিসাবে আরও বেশি বলিষ্ঠ ও ঐক্যবদ্ধ ট্রেড ইউনিয়ন যাতে করে এ ধরনের শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ ট্রেড ইউনিয়ন পুঁজিপতিদের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলিতে হস্তক্ষেপ করতে সমর্থ হয় এবং এইভাবে এই সিদ্ধান্তগুলি প্রভাবিত করার এবং তার ফলাফলগুলি প্রতিহত করার অথবা তার প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া হ্রাস করার কাজে সফল হতে পারে। সর্বোপরি আমি এসম্পর্কে ব্যাপক লে-অফ এবং শিল্প সংস্থাগুলির স্থানান্তরিত বা বন্ধ করার কথা বলছি।

দ্বিতীয়ত, কাজের অবস্থা এবং সামাজিক নিরাপত্তার উপর মজুরির হার সম্পর্কে চুক্তি সংক্রান্ত ধারাকে আরও উন্নত করে তোলা। এখানে পুঁজিবাদী র‍্যাশনালাইজেশনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে: উপযুক্ত মজুরির হার সংক্রান্ত চুক্তির পক্ষে এবং বরখাস্তের বিরুদ্ধে আইনগত গ্যারান্টির দাবিতে কর্মপন্থা, দক্ষতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, শ্রমের ক্রমবর্ধমান একঘেয়েমি বন্ধ করা, কাজের দিন কমানো। বাৎসরিক ছুটি নিয়ন্ত্রণ করা, বিভিন্ন যন্ত্র ও ব্যবস্থাদি পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমিকদের ন্যূনতম সংখ্যা নির্ধারণ করা, নির্ধারিত সময়ের আগে পেনসন মঞ্জুর করার ব্যবস্থা চালু করা ইত্যাদি।

তৃতীয়ত, উৎপাদনের ব্যবস্থাপনায় অংশ গ্রহণের অধিকারের সর্বাধিক ব্যবহার, তার গ্যারান্টি সুনিশ্চিত করা এবং তাকে সম্প্রসারণ করা।

পশ্চিম জার্মানীতে, শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামের ফলে এবং শাসক-শ্রেণীর ব্যবস্থার মধ্যে শ্রমিকশ্রেণীকে সংহত করার জন্য শাসকচক্রের প্রচেষ্টার ফলেও এমন একটি বহুধা-বিস্তৃত এবং বিশেষ ব্যবস্থা হয়েছে যা ট্রেড ইউনিয়ন এবং শ্রমিকশ্রেণীর অন্যান্য সংগঠনগুলিকে তথ্য জানার, তাদের মতামত ব্যক্ত করার, ভেটো প্রয়োগের এবং সিদ্ধান্তের খসড়া রচনার অধিকার দিয়েছে। এই অধিকারগুলি প্রধানত শিল্পসংস্থাগুলির মর্যাদা সংক্রান্ত ১৯৭২ সালের আইনে সুনিশ্চিত করা হয়েছে—এই আইনে কর্মচারীদের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার স্বীকৃত, খনি ও ধাতু শিল্পের ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণের উপরও এই আইন বিধিবদ্ধ এবং ১৯৭৬ সালে গৃহীত উৎপাদন-ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণ সংক্রান্ত তথাকথিত আইনও আছে, যা বৃহৎ সমস্যাগুলিতে তদারকী বোর্ড গঠনের বিষয় নির্বাচন করে। তাছাড়া, শ্রম আইন সংক্রান্ত বিভিন্ন ধারা রয়েছে যেমন পেনসন-আইন, অসুস্থতার সময় মজুরি সংক্রান্ত আইন, বেকার অবস্থায় সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত আইন, এবং সর্বশেষে, কাজের ঘণ্টা সংক্রান্ত আইনের ধারা। এর একটি আইনের প্রস্তাবও ব্যবসায়ীদের প্রতিষ্ঠান অথবা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে উত্থাপিত হয় নি এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে এর একটি আইনও গৃহীত হয় নি। শ্রমিক ও তাদের ইউনিয়নগুলির বলিষ্ঠ কার্যক্রমের ফলেই এই আইন অর্জিত হয়েছে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যেতে পারে যে ১৩ সপ্তাহ ধর্মঘটের ফলে ৬ সপ্তাহ পর্যন্ত অসুস্থতার জন্য পুরা মজুরির ব্যবস্থা আদায় করা হয়।

কিন্তু আমরা জানি, এসব অনেক আইন সত্ত্বেও কোন কোনও গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে, বিশেষ করে পুঁজিবাদী র‍্যাশনালাইজেশনের ফলাফলের দিক থেকে, ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণে শ্রমিকদের অধিকার সীমাবদ্ধ এবং যথেষ্ট নয়। এর সঙ্গে আর একটি ঘটনা অবশ্যই যুক্ত করতে হবে—সে বিষয়টি হল এই যে আদালতে আইনের সীমাবদ্ধ ব্যাখ্যার ফলে শ্রমিকরা তাদের অধিকারের অনেক কার্যকরী অংশ থেকে বঞ্চিত হয়। কিন্তু বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে এইসব অধিকার বাতিল করার অসংখ্য প্রচেষ্টা থেকে প্রমাণিত হয় যে "সামাজিক অংশীদারত্ব"-মুখী অংশগ্রহণের ধারাটিও একচেটিয়া পুঁজি একটি

বিপদ বলে গণ্য করে। বৃহৎ পুঁজি ট্রেড ইউনিয়নের কোন আইনের উপর বিতর্ককালে যখন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে তখনও এই আইন উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ সংক্রান্ত আইন বলে বিবেচিত হয় না। বাধানিষেধের তালিকা থেকে এই দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিফলিত হয় এবং এর অর্থ হল এই যে অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের অধিকার বিস্তারের যে কোন প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ব্যবসায়ীদের প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আপসহীন ভূমিকার কথা ঘোষণা করা।

ট্রেড ইউনিয়নগুলি তাদের বহু প্রস্তাব ও বিবৃতিতে উল্লেখ করেছে যে বিগত কয়েক বছরের ঘটনাবলী ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণের সংগ্রাম এগিয়ে নেয়াকে অপরিহার্য করে তুলেছে এবং এই সংগ্রামের এক নতুন আয়তন ও বিস্তারের সূচনা হয়েছে। জার্মান ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশনের চেয়ারম্যান হ্যান্স ও ফেট্টার সম্প্রতি এক ভাষণে বলেছেন যে তলা থেকে বিভিন্ন স্তরে প্রতিটি কারখানায় প্রতিটি পুঁজিবাদী সংস্থায় এবং সমগ্রভাবে অর্থনীতির ক্ষেত্রে সংগ্রামের প্রধান দিকটি হল সংহতি বৃদ্ধি করা, বিভাগীয় ইউনিয়ন কর্তৃক অনুসৃত মজুরি নীতির সংযোগ সাধন, প্রতিটি সংস্থায় গৃহীত চুক্তিগুলি বাস্তবে কার্যকর করার উপর বিশেষ জোর দেওয়া। তিনি আরও বলেন যে সেইসঙ্গে বিভিন্ন স্তরে উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় ব্যাপকভাবে অংগ্রহণের কাজ অর্জন করা ও তা ব্যবহার করা প্রয়োজন। তাছাড়া ট্রেড ইউনিয়নগুলির সাহায্যে আগে থেকে সতর্কীকরণ ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে করে শ্রমিকশ্রেণীকে পুঁজিবাদীদের প্রধান সিদ্ধান্তগুলি, বিশেষ করে র‍্যাশনালাইজেশনের সিদ্ধান্ত আগেই জানানো যায় এবং তার ফলে শ্রমিকশ্রেণী পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণে সমর্থ হবে। এটা বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ যে ট্রেড ইউনিয়নগুলি কারখানা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তাদের কাজকে উদ্দীপিত করার জন্য সচেষ্ট। আমি মনে করি যৌথ কাজ, উৎপাদন পরিষদ, পরিচালক সংস্থায় এবং ট্রেড ইউনিয়ন শাখাগুলিতে শ্রমিকদের ও ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি প্রভৃতি সকলের মধ্যে সহযোগিতা থাকবে। আমরা এখন প্রত্যক্ষ করছি উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ন নীতির জরুরী লক্ষ্য ও কর্মনীতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ও আলোচনার মাধ্যমে ব্যাপক মতবিনিময়। এই কাজ বহুজাতিক সংস্থা-গুলিতেও পরিচালনা করতে হবে।

জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি ব্যবস্থাপনায় গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের জন্য সংগ্রামকে শ্রেণীসম্পর্ক সুস্পষ্ট করে তোলার এবং শ্রেণী চেতনা উন্নত করার কার্যকর পথ হিসাবে বিবেচনা করে। ব্যবস্থাপনায় গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ সম্পর্কে জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচী ও সুপারিশগুলির মধ্যে যে বিষয়গুলি রয়েছে তার অধিকাংশের সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়নগুলির শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গীর মিল আছে। জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি তাদের দাবি সমর্থন করে এবং সেই সঙ্গে এবং আরও বেশি সুদূরপ্রসারী কর্মপন্থা গ্রহণের আহ্বান জানায়।

আমরা কারখানা ও সমগ্র ট্রেড ইউনিয়ন স্তরে অগ্রগামী পদক্ষেপ লক্ষ্য করছি এবং আমরা প্রত্যক্ষ করছি মজুরির হার এবং সেই সঙ্গে শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণে ট্রেড ইউনিয়নগুলির সংগ্রামশীলতা এবং এই সংগ্রাম ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করার এবং বৃহৎ পুঁজির প্রভুত্বকে খর্ব করার অভিযানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি এমন প্রতিটি উদ্যোগ সমর্থন করে যা পুঁজিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থানকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করে।

আইনগত নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত রাজনৈতিক দাবি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক মঞ্চে উগ্র দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলির আরও বেশি সক্রিয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, সোশ্যাল-ডেমোক্রাট পরিচালিত ফেডারেল সরকার সংস্কারের জন্য তার প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার করায় এবং শ্রমিকশ্রেণীর সমস্ত সমস্যা তীব্র ও জটিল হতে থাকায় শিল্প ব্যবস্থাপনায় বহু প্রতিক্ষীত শ্রমিকদের অংশগ্রহণের দাবি এবং শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন এগিয়ে নেয়া অত্যাবশ্যক। একটি মাত্র সমস্যার উপর আলোচনাকে কেন্দ্র করে, যেমন, তদারকী পরিষদ গঠন করা, এবং এই সমস্যাকে সমান প্রতিনিধিত্বের দাবির মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে পরিস্থিতির আমূল উন্নতি লাভ সম্ভব নয়। কমিউনিস্টরা এইসব ট্রেড ইউনিয়ন দাবিগুলির জন্য সংগ্রামকে বর্তমান ক্ষমতার কাঠামোগুলোর বিশেষ করে, বহুজাতিক কর্পোরেশন প্রভৃতির মুখোস খুলে দেওয়ার সুযোগ হিসাবে বিবেচনা করে এবং তারা এই দাবিগুলির জন্য সংগ্রামকে ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণের জন্য আরও বেশি অর্থপূর্ণ দাবির প্রতি ক্রমে গুরুত্ব দেওয়ার সুযোগ হিসাবে গণ্য করে।

এ ক্ষেত্রেও আমাদের পার্টির মোক্ষম কর্তব্য হল শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করা

কাজে উৎসাহিত করা, ট্রেড ইউনিয়ন ঐক্য শক্তিশালী করা এবং শ্রমজীবী জনগণের অধিকার রক্ষার এবং সামাজিক সম্পর্কের নির্দিষ্ট রূপ গ্রহণের কাজে তাদের আরও বেশি সক্রিয় হতে সাহায্য করা। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, এর অর্থ হল ট্রেড ইউনিয়নে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা, রাষ্ট্র, দল, ধর্ম এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা, বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে সহনশীলতা সুনিশ্চিত করা এবং ট্রেড ইউনিয়ন ও জার্মান কমিউনিস্ট পার্টিসহ আন্দোলন সমেত শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে সংহতির আদর্শে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।

শ্রেণী "সমঝোতা" সম্বন্ধে শ্রমিকেরা নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করে

বার্ট র‍্যামেলসন
গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টি

আমরা এটা শুরুতেই সুস্পষ্ট করে বলতে চাই যে নিম্নলিখিত চিন্তা-ভাবনা এবং প্রস্তাবগুলি আজকের দিনে ব্রিটেনে পুঁজিবাদী সমাজের কাঠামোর মধ্যে শিল্প সংক্রান্ত গণতন্ত্র সম্প্রসারণের পথের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। আমরা যে বিষয়টি আলোচনা করছি তা কোন বিমূর্ত ধরনের শ্রমিকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ নয়। আমরা আলোচনা করব কিভাবে পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমিকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ সম্প্রসারিত করা যায়। আমি যেমন মনে করি এবং আমাদের সবাই যে কথা স্বীকার করবেন যে শ্রমিকদের ক্ষমতা লাভের পরেই সম্পূর্ণ-ভাবে শ্রমিকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রন সম্ভব।

আমাদের অবশ্য মনে রাখতে হবে যে শ্রমজীবীমানুষ অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে অনুভব করে যে তাদের শ্রম বা কাজের অবস্থার এবং উৎপাদন ও বণ্টনের ক্ষেত্রে যে সিদ্ধান্তগুলি প্রভাবিত করে সেই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তাদের বিশেষ বক্তব্য থাকা উচিত। বর্তমানে তারা এটা চায়। উপরন্তু, শিল্প সংস্থার এক

গ্রুপের দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে আধুনিক সমাজ, আধুনিক শিল্প বাস্তবতার দিক থেকে আর কিছুতেই পরিচালিত হতে পারে না, বিশেষ করে যখন এরা হল জনসংখ্যার অতি ক্ষুদ্র সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশ—কোম্পানি অথবা কারখানায় তাদের স্বার্থ হল প্রায় একান্তভাবেই অর্থকরী। এ ধরনের সিদ্ধান্তগুলি অত্যন্ত সংকীর্ণতা ভিত্তিক। এটাও ক্রমবর্ধমানভাবে উপলব্ধি হচ্ছে যে শিল্পের ক্ষেত্রে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি সামাজিক সিদ্ধান্ত এবং আজকের যুগে এটা বিশেষভাবে সত্য যেহেতু আজকের যুগ হল অর্থনৈতিক অসুবিধা ও প্রতিবন্ধকতার যুগ, গণবেকারি এবং নতুন প্রযুক্তিগতবিদ্যা প্রবর্তনের যুগ।

বিগত ১০০ বছরের উপর শিল্প ভিত্তিক গণতন্ত্রের যে সম্প্রসারণ ঘটেছে তাতে শিল্পের যে দুইটি দিক ব্যবস্থাপনা ও শ্রম এই দুয়ের মধ্যে আলাপ-আলোচনার পরিধি বিস্তার লাভ করেছে। বর্তমানে মজুরি, কাজের অবস্থা, কাজের ঘন্টা, প্রান্তিক সুযোগ সুবিধা, শৃংখলা ইত্যাদি মধ্যস্থতা ও চুক্তির বিষয় বস্তু যেখানে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন শক্তিশালী সেখানে যৌথ দর কষাকষির ক্ষেত্রও প্রসারিত হয়েছে এবং সেখানে অতিরিক্ত দাবির প্রশ্নও যুক্ত হয়েছে। এটা উপলব্ধি করে আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে এই সব অবস্থা এখনও সার্বজনীন হয়ে ওঠে নি এবং অনেক শিল্প এবং এলাকা রয়েছে যেখানে পরিচালকদের বিশেষ ক্ষমতা বা অধিকার প্রয়োগ করা হয় এবং কর্মচারীদের কিছুটা নিরাপত্তা বিধানের জন্য সরকারি হস্তক্ষেপকে কাজে লাগানো হয়। সর্বোপরি এটা সুস্পষ্ট যে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজি প্রকৃত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে। আমাদের এখন পর্যন্তও কোন সন্দেহ নেই যে এর প্রভুত্ব অবশ্যই খর্ব করতে হবে। কিন্তু কি ভাবে শ্রমিকেরা উৎপাদন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের আরও বেশি বেশি বক্তব্য উপস্থিত করার অধিকার অর্জন করতে পারে? যে পরিচালকমণ্ডলী পুঁজিবাদী স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে তাদের কী উপায়ে নিয়ন্ত্রিত বা সঙ্কুচিত করে রাখা যেতে পারে যাতে তারা শ্রমজীবী মানুষের ও সমগ্রভাবে সমাজের স্বার্থের প্রতিকূল একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে বিরত থাকে? এটাই হল এব্যাপারে জটিলতা।

একটি মৌলিক মার্ক্সবাদী তত্ত্ব হল এই যে উৎপাদন ও বণ্টনের ক্ষেত্রে পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে আপস মীমাংসার অসাধ্য এক বিরোধ রয়েছে। সুতরাং

কী ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় এই দুই পক্ষের মধ্যে সমঝোতা গড়ে তোলা যেতে পারে? আমি এ ক্ষেত্রে মনে করি, প্রকৃতপক্ষেই "সমঝোতা" একটি ভুল সূত্র। সব কিছুই শ্রম ও ব্যবস্থাপনার (পুঁজির পক্ষে) মধ্যে মুখোমুখি বিরোধিতার মাধ্যমে নির্ধারিত হতে পারে অপর পক্ষে, যে প্রতিটি নির্দিষ্ট সংগ্রাম পুঁজিবাদী কাঠামোর মধ্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যমান সেই সংগ্রামের ফলাফল নির্ধারণ করে একদিকে, শ্রমিক ও অন্যদিকে, পুঁজি এই উভয়ের মধ্যে শক্তির ভারসাম্য। শিল্প ভিত্তিক গণতন্ত্র প্রসারিত করার পথ স্থির করার ক্ষেত্রে এই মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণ করা গুরুত্বপূর্ণ এবং এটা কোন সহজ সমস্যা নয়।

প্রায় দশ বছর ধরে ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণের মতো একটি প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে বিতর্ক চলে আসছে। আমাদের আত্ম-সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গী থাকতে হবে, কারণ আমি বিশ্বাস করি যে সাধারণভাবে মার্ক্সবাদ এবং বিশেষ করে কমিউনিস্টরা এবং আমি এখন ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কেও বলছি যে আমরা সকলেই এই বিতর্কে কিছুটা বিলম্বে অংশ গ্রহণ করেছি। আমি পরিস্থিতি সম্পর্কেও অবহিত আছি। এই সমস্যা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা সুরু করতে আমরা কিছুটা বাধ্য হয়েছি, কারণ আকস্মিকভাবে "অংশগ্রহণ" "সহ নির্ধারণ" "অংশীদারী" "যৌথ নিয়ন্ত্রণ" প্রভৃতি নতুন নতুন শব্দ সংবলিত বিস্তৃত রচনা এবং নতুন শব্দভাণ্ডারের সৃষ্টি হয়েছে। এবং এটা গোলমেলে যে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের মধ্য থেকে এই শব্দ বা রচনার সব কিছুর উদ্ভব হয় নি। ফিন্যান্সিয়াল টাইমস লণ্ডনে একটি আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্র সংগঠিত করার জন্য আড়াই লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় করে—ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে শ্রমিকদের যুক্ত করার সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য এই আলোচনাচক্রে ফিন্যান্সিয়াল টাইমস-এর পক্ষে বিশ্বের কয়েকজন পরাক্রমশালী পুঁজিপতি এবং সেই সঙ্গে কয়েকজন দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদী ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়। সুতরাং আমরা আমাদের নিজেদেরই প্রশ্ন করব: কেন হঠাৎ পুঁজিপতিরা শিল্প ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণের জন্য শ্রমিকদের যুক্ত করা নিয়ে আলোচনা সুরু করে দিল?

বিভিন্ন কাঠামো ও বিভিন্ন পদ্ধতির কথা আলোচনাচক্রে উপস্থিত করা হয়। কেউ কেউ প্রস্তাব করলেন যে দুইটি বোর্ড থাকা উচিত, এর একটি

হল তদারকী বোর্ড এবং আরেকটি হল কার্যনির্বাহী বোর্ড। অনেকে আলোচনার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করলেন—আবার অনেকে বললেন যে বোর্ডে স্বীকৃত বা সরকারি ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের থাকতে হবে। আবার এমনও অনেকে ছিলেন যারা ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত থাকুন আর না-ই থাকুন এমন সমস্ত শ্রমিকদের অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণকারী সংস্থায় নির্বাচিত হওয়ার অধিকারের প্রয়োজনীয়তা "স্বীকার" করতে প্রস্তুত বলে অভিমত ব্যক্ত করলেন। কেন এ ধরনের উৎকণ্ঠা?

বিতর্ককালে ট্রেড ইউনিয়নের সংস্কারবাদী নেতাদের তরফ থেকে প্রস্তাব পুস্তিকা আসতে থাকল। অন্যান্য "বামপন্থী" মহল থেকেও তথ্যাদি উপস্থিত করা শুরু হল। এদের সঙ্গে বৃহৎ পুঁজি এবং সংস্কারবাদী ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের প্রস্তাব ও ভাবধারার প্রায় সম্পূর্ণ মিল ছিল।

আলোচনা ও বিতর্কের বাইরে এই বিষয়টি চলে যায়। সরকার ও পরিচালকমণ্ডলী কতকগুলি প্রস্তাব বাস্তবে কার্যকর করার জন্য কাজ শুরু করে দিল। একটি বিশেষ রয়েল কমিশন গঠিত হল—প্রথমে এ প্রস্তাব ছিল রক্ষণশীল সরকারের, এবং যখন এই সরকার নির্বাচনে পরাজিত হল তখন এই প্রস্তাব প্রকৃতপক্ষে কার্যকর করে শ্রমিক দলের সরকার।

রয়েল কমিশনের কাছে অত্যন্ত উন্নত ধরনের ধর্মঘটের তথ্য পেশ করা হয়। এর ফলে পুঁজি এই সংগ্রামকে নিরুৎসাহিত করার উপায় অনুসন্ধানের চেষ্টা করে। কমিশনের তথ্য অনুসারে জানা গেল যে ১৯৬০ দশকের শেষে সমস্ত ধর্মঘটের ৯৫ শতাংশই ছিল বেসরকারি অর্থাৎ ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের পরামর্শ উপেক্ষা করেই এ ধর্মঘটের আহ্বান জানানো হয়। এই ধর্মঘটগুলি জাতীয় চরিত্রের রূপ নিয়েছিল, কোন কোন সময় একটি গোটা শিল্পই এই ধর্মঘটে জড়িয়ে পড়ে, কোন কোন সময় বহু বিভিন্ন ধরনের কারখানা সহ বিরাট বহুজাতিক সংস্থাও এই ধর্মঘটে যুক্ত হয়।

প্রশ্ন হল: বিভিন্ন ধরনের সম্প্রসারিত "অংশগ্রহণ" কী পুঁজির নিজের পথে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের অগ্রগতি হার রিত শক্তি ও সংগ্রা মুখিতা এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলির আমূল পরিবর্তন প্রভৃতির প্রতি সমর্থন দানের প্রয়াস? কারণ, এটা একটা ঘটনা যে ইউরোপে শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে ট্রেড ইউনিয়নগুলি বৃদ্ধি লাভ করেছে এবং উন্নত হয়েছে। ইউনিয়নের সমগ্র

ইতিহাসে আমরা ট্রেড ইউনিয়ন সভ্যপদের সর্বোচ্চ স্তর অর্জন করেছি। (তুলনামূলকভাবে, আমেরিকায় ট্রেড ইউনিয়ন সংগ্রামের ঝোঁক নিম্নগামী—সেখানে "অংশগ্রহণের" প্রশ্ন নেই বললেই চলে।)

অবশ্য আমাদের বুঝতে ও ভাবতে হবে যে উৎপাদনের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে পরিচালকমণ্ডলীর অধিকার খর্ব করার এবং শুধু ভবিষ্যতের বা সমাজতন্ত্রের আমলের কথা নয়, আজকের দিনে এই বিশেষ ক্ষেত্রে শ্রমিকদের নিজেদের অধিকার ও প্রভাব বিস্তারের জন্য শ্রমিকদের আশা ও দাবি পূরণ করতে গঠনমূলক প্রস্তাব গ্রহণে ব্যর্থতার ফলে আমরা উদ্যোগ হারিয়ে ফেলছি কিনা।

সুতরাং আমরা সমস্ত প্রশ্নটাই পরীক্ষা করে দেখতে শুরু করেছি। ট্রেড ইউনিয়নগুলি কীভাবে সাফল্য অর্জন করেছিল এবং শ্রমিকশ্রেণীর বিভিন্ন লক্ষ্য অর্জনে কোন পদ্ধতি বিশেষভাবে কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে তা আমরা বুঝতে চেয়েছি।

দু'শ বছরের চেয়েও আগে ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়নের জন্ম হয়। প্রথম থেকেই তাদের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও কাজ ছিল শ্রমিকদের উপর, সর্বোপরি, মজুরির প্রশ্নে, পুঁজির এককভাবে সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা সীমিত করা। শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধভাবে মালিকদের মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়েছিল। এটা এই অর্থে শ্রমিকদের "নেতিবাচক" নিয়ন্ত্রণ বলা চলে যে শ্রমিকরা কাজ বন্ধ করতে ও ঘোষণা করতে সক্ষম ছিল: "তোমাদের সিদ্ধান্ত আমাদের উপযোগী নয়। আমরা আমাদের বক্তব্য রাখতে চাই।"

অর্থাৎ ট্রেড ইউনিয়নের সমগ্র ধারণা ও ট্রেড ইউনিয়নের উদ্ভব শুরু হয় শ্রমিকদের কাজের অবস্থার উপর শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণের পথে প্রথম পদক্ষেপের মাধ্যমে। কমরেড মুলার তাঁর লেখায় সঠিকভাবেই এ কথার উপর জোর দিয়েছেন। অবশ্য, প্রথমে দুইটি কারণে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের পরিধি সংকীর্ণ ছিল। প্রথমত, সিদ্ধান্ত গ্রহণে পরিচালকমণ্ডলী হিসাবে তাদের বিশেষ অধিকারের ধারণাটি শ্রমিকশ্রেণীর চিন্তায় অনুপ্রবেশ করেছিল। এটা একটা পবিত্র অধিকার এবং এটা চ্যালেঞ্জ করা যায় নি—সুতরাং সম্পত্তির অধিকারের চেয়েও বেশি। দ্বিতীয়ত সে সময় ইউনিয়নগুলি ছিল অত্যন্ত দুর্বল এবং তাদের কাজ সম্পর্কে ধারণা ছিল অস্পষ্ট। কিন্তু ট্রেড ইউনিয়নের

ইতিহাস হল চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে পরিচালকমণ্ডলীর সঙ্গে শেয়ারের জন্য সংগ্রামের ইতিহাস। আমি ইচ্ছাকৃতভাবে বলছি "শেয়ার"—আমি তাকে বলছি না "যুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ।" আমি বলব না "সহ-নির্ধারণ"—এটা জার্মান শব্দ "মিটবেসটিমাং"-এর ইংরেজী তর্জমা, কারণ, "মিটবেসটিমাং"-এর অর্থ হল: দুইটি বিরোধী পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তাদের অভিন্ন স্বার্থে এই সিদ্ধান্তের প্রতি উভয়ের সম্মতি প্রদান। আলোচনার জন্য কাছাকাছি আসার এবং যুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ধারণাকে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ও তার আইন-কানুন একটি স্থায়ী আদর্শমূলক পবিত্র ধারণা বলে বদ্ধমূল করতে চায় এবং এ সম্পর্কে আমাদের সজাগ থাকা উচিত। আমরা বিশ্বাস করি যে এই ধারণা শ্রমিকশ্রেণীর মতাদর্শ থেকে আপসহীন বিরোধিতা বা দ্বন্দ্বের ভাবধারা মুছে দেয়।

আমরা আমাদের প্রশ্ন করেছিলাম কেন পুঁজি সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে শ্রমিকদের যুক্ত করতে চায়। কেন শ্রীমতী থ্যাচার সরকারের কর্মসংস্থান দপ্তরের সেক্রেটারি অব স্টেট-এ সম্পর্কে উপযোগী আইন প্রবর্তনের আবশ্যকতার কথা বলেন?

আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে বর্তমান পরিস্থিতিতে পুঁজিবাদ যে বিশাল বিনিয়োগ করেছে, বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের পটভূমিতে, যখন সম্পূর্ণ নতুন ধরনের কাজ প্রয়োজন, যখন বিপুলভাবে "দক্ষতাচ্যুতি" ঘটছে, যখন উৎপাদনের সুসংবদ্ধ প্রক্রিয়া এমন পর্যায়ে এসেছে যে শ্রমিকদের এক অঙ্গী ক্ষুদ্র অংশ সমগ্র উৎপাদন প্রক্রিয়াকে বানচাল করতে পারে, কারণ শ্রমিকেরা ধর্মঘটের ডাক দিতে পারে এবং প্রয়োজন হলে ট্রেড ইউনিয়নগুলির সমর্থনে দীর্ঘ দিন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে পারে, তখন শ্রমিকদের দিয়ে শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ করানো পুঁজির পক্ষে অত্যন্ত মোক্ষম পথ হিসাবে দেখা দেয়। এই উদ্দেশ্যে শ্রমিকদের মধ্যে বিশ্বাস জন্মাতে হবে যে পুঁজিপতিদের সঙ্গে তাদের অভিন্ন স্বার্থ রয়েছে এবং পুঁজিপতিদের সঙ্গে তাঁরা একইভাবে এ কাজ পরিচালনা করতে পারে কারণ এ ক্ষেত্রে তাদের ঝুঁকি আছে।

যখন পুঁজি ট্রেড ইউনিয়নগুলির উদ্ভব প্রতিহত করতে ব্যর্থ হল তখন সে দ্বিতীয় অবস্থান গ্রহণ করে। এবং দ্বিতীয় অবস্থানটি ছিল: "আমরা ট্রেড

ইউনিয়নগুলির আবির্ভাব বন্ধ করতে পারি নি সুতরাং তাদের আমাদের মধ্যে একাত্ম করে নিতে হবে, আমাদের ব্যবস্থাপনার মধ্যে যুক্ত করতে হবে এবং আমাদের স্বার্থে তাদের কাজে লাগাতে হবে।" কিন্তু এ পর্যন্ত ব্রিটেনে এটা অসম্ভব বলে প্রমাণিত হয়েছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল সপ-স্টিউয়ার্ড আন্দোলন (আমার মনে হয় "সপ স্টিউয়ার্ড" প্রায় একটি আন্তর্জাতিক শব্দ বা কথায় পরিণত হয়েছে।) বর্তমানে একজন ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকর্তার সঙ্গে একজন সপ-স্টিউয়ার্ডের কী পার্থক্য রয়েছে?

সপ-স্টিউয়ার্ড একজন শ্রমিক—সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রে তিনি নির্বাচিত হন এবং প্রতি বছরই তার পুনঃনির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা থাকে। তার কাজের অবস্থা, তার বেতন বা তার মজুরি ঠিক তার সহকর্মীদের মতই। সপ-স্টিউয়ার্ড আন্দোলনের বৃদ্ধি ঘটেছে এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গণতন্ত্রীকরণে একটি শক্তিশালী আন্দোলন হিসাবে প্রতিপন্ন হয়েছিল—এই আন্দোলনের ফলে ইউনিয়নের উচ্চপর্যায়ের সংস্কারবাদী নেতাদের ক্ষেত্রে সমস্ত শ্রমিকের পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার এবং তা কার্যে পরিণত করার নিশ্চয়তা বিধানে অসুবিধা ছিল, কিন্তু অসম্ভব ছিল না।

কিন্তু এটা সুস্পষ্ট যে সাময়িকভাবে ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে "একাত্ম" করার নীতিতে যথেষ্ট ফল হয় নি। এটা থেকে বোঝা যায় কেন পুঁজি সপ-স্টিউয়ার্ডদের দুর্নীতিপরায়ণ করে তোলার পথ সম্পর্কে চিন্তা করা সুরু করছে, কেন কর্মস্থলের মধ্যে সাধারণ কর্মীদের যুক্ত রেখে প্রকৃত কাজের অবস্থা থেকে তাদের দূরে সরিয়ে রাখছে এবং সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে নামেমাত্র অংশগ্রহণের আভাস দিয়ে যাচ্ছে। পুঁজি আশা করে যে—যেহেতু সপ-স্টিউয়ার্ড-এর উপর তার সহকর্মীরা আস্থাশীল তাই সপ-স্টিউয়ার্ড সুফল আনতে পারে।

আমাদের বিশ্লেষণ থেকে এটা সুস্পষ্ট যে এমন দিন ছিল যখন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এবং ব্রিটেনে মজুরি ও কাজের ঘণ্টার উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে শুধু একটা বক্তব্য রাখার জন্য শ্রমিকরা দাবি পেশ করত কিন্তু আজ আর সেদিন নেই। কমরেড মুলার সঠিকভাবেই উল্লেখ করেছেন যে ট্রেড ইউনিয়ন এবং শ্রমিকেরা উপলব্ধি করেছে যে বর্তমানে পরিচালকমণ্ডলীর

প্রতিটি সিদ্ধান্তই তা নতুন প্রয়োগ কৌশল এবং প্রযুক্তিবিদ্যা প্রবর্তনের ক্ষেত্রেই হোক অথবা কত পরিমাণ বিনিয়োগ করা হবে, কোথায় নতুন কারখানা স্থাপন করা হবে, কোন কোন নতুন পণ্য উৎপাদন করতে হবে রপ্তানীর জন্য পণ্য উৎপাদন অথবা পুঁজি রপ্তানী করা এবং বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে বিদেশে উৎপাদন ইউনিট গঠন প্রভৃতি প্রতিটি পরিচালকমণ্ডলীর গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত প্রত্যক্ষভাবে শ্রমিকদের উপর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং তা শ্রমিকদের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত এবং এই সিদ্ধান্তের ফলশ্রুতি হিসাবে শ্রমিক তার কাজে নিযুক্ত থাকতেও পারে—আবার কাজ হারাতেও পারে। সুতরাং ট্রেড ইউনিয়নগুলি দাবি করতে শুরু করে যে এই সিদ্ধান্ত-সমূহ আলোচনার জন্য উপস্থিত করতে হবে। এবং পুঁজিপতিরা উপলব্ধি করতে সক্ষম যে এ দাবিগুলি তারা এড়িয়ে যেতে পারে না সেজন্যই কেন অন্ততঃ ব্রিটেনে পুঁজিপতিরা প্রতিনিয়ত পশ্চিম জার্মানীর দৃষ্টান্ত দিচ্ছে কারণ সেখানে শিল্প ব্যবস্থাপনার "অংশগ্রহণ" ব্যাপকভাবে চলছে। এ থেকে এটা বোঝা যায় কেন বারোয়ারি বাজার বর্তমানে তার সদস্য দেশগুলির উপর পশ্চিম জার্মানীর "মিটবেসটিমার" মডেলের "অংশগ্রহণ" সংক্রান্ত আইনটি কৌশলে চাপিয়ে দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে—এই আশা নিয়ে এটা করা হচ্ছে যে ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণ চালু করা হলে এক মোহ সৃষ্টি করা হবে এবং এইভাবে শ্রমিকশ্রেণী ও তার ইউনিয়নগুলির জঙ্গী সংগ্রাম অবলুপ্ত হবে।

এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এ ধরনের শিল্প সংক্রান্ত গণতন্ত্রের বিশাল অভিজ্ঞতা সম্পন্ন দেশ পশ্চিম জার্মানীতে গৃহীত পদ্ধতি শিল্প ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্তগুলিকে প্রভাবিত করার ও পরিবর্তন করার জন্য শ্রমিকদের ক্ষমতাকে সামান্যই শক্তিশালী করেছে। বস্তুতপক্ষে, কারখানা স্তরে এটা ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনকে দুর্বল করেছে যেহেতু তদারকী বোর্ডের আলোচনাগুলি হামেশা ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপের বিকল্প হয়ে দাঁড়ায়। বিভিন্ন তথ্য থেকে প্রমাণিত হয় যে সিদ্ধান্তগুলির উপর প্রভাব ব্রিটেনে সংগঠিত শ্রমিকদের চেয়ে পশ্চিম জার্মান শ্রমিকদের অনেক কম। সুতরাং, দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় যে ভলকসওয়াগেন এ জি-র তদারকী বোর্ড ২৫,০০০ শ্রমশক্তি হ্রাস করার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তা শ্রমিকদের নিরস্ত্র করে দেয়। অপর দিকে আপার

ক্লাইড জাহাজ নির্মাণ কারখানার পরিস্থিতি একই রকম ছিল কিন্তু সেখানের শ্রমিকেরা অনুরূপ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এবং পরবর্তীকালে সরকারকে তার মনোভাব পুনর্বিবেচনা করাতে সমর্থ হয়।

এ থেকে আমাদের সিদ্ধান্ত হল :

শিল্প ভিত্তিক গণতন্ত্রে শ্রমিকেরা কিছু সাফল্য অর্জন করেছে এবং শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ-প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আশানুরূপ অগ্রগতি হয়েছে। কিন্তু আমরা নিজেদেরকেই প্রশ্ন করেছিলাম কীভাবে তারা এটা অর্জন করেছিল। উত্তর বেশ স্পষ্ট। তারা কোন মোহ সৃষ্টি করে নি যে মালিকদের সঙ্গে মুখোমুখি মোকাবিলা ছাড়াই অন্য কোন পথ আছে এবং তাদের সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তা পারস্পরিক চুক্তির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। অবশ্য পুঁজিবাদী সমাজে প্রতিটি আলাপ-আলোচনা আপস-মীমাংসায় শেষ হয় কিন্তু প্রতিদিন সে আপসের চরিত্র বদলে যায়, কারণ একটি নির্দিষ্ট সময়ে শক্তির যে বিশেষ ভারসাম্য থাকে আপসের ক্ষেত্রে সেটারই ছাপ পড়ে। আমরা বিশ্বাস করি যে এ পরিবর্তন অধিকতর ভালর দিকে। সুতরাং আজ শ্রমিকরা যা হারাচ্ছে আগামীকাল তা তারা জয় করবে অবশ্য যদি তারা তাদের ক্ষতি থেকে কিছু শিক্ষা গ্রহণ করে।

আমাদের অভিজ্ঞতাই একটি বেসরকারি শিল্পের পরিচালক বোর্ডে আনুষ্ঠানিকভাবে শ্রমিকদের অংশগ্রহণের ধারণাকে বিরোধিতা করতে প্রবুদ্ধ করে। আমরা বিশ্বাস করি যে এর ফলাফল হল সংগ্রামকে নিস্তেজ নিষ্প্রভ করে দেওয়া এবং একটা মোহ সৃষ্টি করতে পুঁজি সর্বদাই সচেষ্ট রয়েছে যাতে করে শ্রমিকেরা ভাবতে শেখে : "আমাদের একটি অভিন্ন স্বার্থ আছে এটা আমাদের কারখানা, শুধু আমার নয় এটা তোমারও কারখানা।" মালিকেরা শ্রমিকদের বলছে : "আপনারা সাহায্য করুন—লাভের সঙ্গে আমাদের একই কারখানা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করুন, কারণ, সর্বোপরি, আমাদের কারো বিরুদ্ধে সমভাবে প্রতিযোগিতা চালিয়ে যেতে হবে।"

এইভাবে কর্তৃপক্ষ একদল শ্রমিককে কাছে টানে, অন্য সংস্থার বিরুদ্ধে অন্য শ্রমিকের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতায় নামায় এবং এখানেই বিভেদের বিপদ নিহিত।

সুতরাং আমাদের সাধারণ বক্তব্য হোলো যে, শ্রমিকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ এমন একটি স্লোগান, যার শ্রেণী ও রাজনৈতিক তাৎপর্য আছে। পুঁজিবাদের কাঠামোর মধ্যেই যে লক্ষ্য অর্জিত হয়, কোনো রকম মোহ না রেখে এই ধারণার বিরুদ্ধে সর্বদাই লড়তে হবে। শ্রমিকদের জানতে হবে যে সংঘাতের মাধ্যমেই নিয়ন্ত্রণ অর্জিত হবে। পুঁজিবাদে শ্রমিকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রণের প্রকৃত সীমাবদ্ধতা তখন শ্রমিকরা বুঝবে। প্রকৃত ও পূর্ণ শ্রমিকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রণের বাধাস্বরূপ সামাজিক ব্যবস্থা পাল্টানোর সংগ্রামে জয়লাভ করতে এইভাবে আমরা তাদের সাহায্য করি।

পুঁজিবাদী কাঠামোর মধ্যেই আমাদের একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র আছে। ১৯৭৮ সালে মাত্র জাহাজ নির্মাণ ও বিমান কারখানা জাতীয়করণ হয়েছে। এটা সংগ্রামের ফল, কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের ফল নয়। রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র থাকলেও এবং পুঁজিবাদী রাষ্ট্র তার স্বার্থে অর্থাৎ ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে তাকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করলেও, মতাদর্শগতভাবে এটা বোঝানো সম্ভব যে, রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের পরিচালন কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিকদের মধ্যে কোন মৌলিক, মীমাংসাতীত বিরোধ নেই। কারণ ঐ কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য কোন রকমে সর্বোচ্চ মুনাফা করা নয় এবং উচিতও না। শ্রমিকরা যে নীতির জন্য সংগ্রাম করছে, সেই নীতির সমর্থনে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের সাথে সংহতি আন্দোলনের সমগ্র প্রোথীকে অংশগ্রহণ করানো সম্ভব। সেইজন্য রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আমরা স্বীকার করি।

শ্রমিকের অংশগ্রহণ সহ গণতান্ত্রিকভাবে গঠিত একটি বোর্ড প্রথার পক্ষে আমরা, যে বোর্ড সংস্থা চালানোর দায়িত্বে থাকবে এবং শিল্পের শ্রমিকদের ও পার্লামেন্টের প্রতি জবাবদিহি করবে। এই বোর্ডের চারটি নির্বাচনক্ষেত্র থাকবে :—

(১) যেসব ডিরেক্টর শিল্পের শ্রমিকদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত হবে এবং তাদের কাছে দায়ী থাকবে। এই প্রতিনিধিরা ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে নির্বাচিত হবে এবং এদের ফিরিয়ে আনা যাবে। আমরা মনে করি এই ডিরেক্টরেরা ট্রেড ইউনিয়নের পদে একই সাথে থাকবে না।

(২) সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের প্রতিনিধিত্বকারী টি ইউ সি দ্বারা নিযুক্ত ডিরেক্টর। আমরা মনে করি যে শ্রমিক প্রতিনিধিত্বকে শিল্পের শ্রমিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে গোষ্ঠীগত স্বার্থের উদ্ভব হতে পারে অথচ সমগ্র জনগণের স্বার্থে গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন।

(৩) বিশেষ স্বার্থ সহ প্রতিনিধিত্বমূলক বডির দ্বারা ডিরেক্টর নির্বাচিত হবে, যেমন মেট্রোপলিটান বা কাউন্টি কাউন্সিল, ওওেল্‌স্‌ বা স্কট্‌ সভা যেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

(৪) রাষ্ট্রীয় মালিকানায় বিশ্বাসীদের সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ডিরেক্টর। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের কাঠামোর অন্যতম দুর্বলতা হোলো যে, উচ্চপদের লোকেরা আসে মূলত ব্যক্তিমালিকানাধীন শিল্প থেকে এবং তারা রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ও গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণে বিশ্বাসী নয়।

শিল্পের আকারের ওপর বোর্ডের আকার নির্ভর করলেও আমরা মনে করি নীতি এটাই হওয়া উচিত যে বোর্ডে শ্রমিক প্রতিনিধি ও টি ইউ সি দ্বারা নিযুক্ত ডিরেক্টরের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকবে।

দক্ষ ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন এবং আমরা প্রস্তাব করি যে, এই ব্যবস্থাপনা বোর্ডের নীতি কার্যকর করবে ও তার প্রতি দায়িত্বশীল থাকবে এমন চুক্তিতে নিয়োগ করা দরকার।

অপরদিকে, বোর্ড সংশ্লিষ্টমন্ত্রীও পার্লামেন্টের কমিটির প্রতি দায়িত্বশীল থাকবে এবং পার্লামেন্টারী কমিটির মতামতকে মর্যাদা দিয়ে পার্লামেন্টের বিবেচনা ও জনগণের আলোচনার জন্য বিষয়াদি সরবরাহ করবে।

সপ-স্ট্রয়াড কমিটির কারখানার ব্যবস্থাপনার নিয়োগসহ নীতিগত ব্যাপারে বাধ্যতামূলক আলোচনার অধিকার থাকা উচিত।

প্রস্তাবিত কাঠামো সম্পর্কে কিছু বক্তব্য।

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের শ্রমিকদের উৎপাদন ও উৎপন্ন দ্রব্য বাজারীকরণের ব্যাপারে বক্তব্য থাকা উচিত এই ধারণার কিছু বিপদ আমরা দেখতে পাচ্ছি। গোষ্ঠীগত বক্তব্য কোন নির্দিষ্ট শিল্পের শ্রমিকদের স্বার্থানুগ হলেও অন্য শ্রমিকদের তা স্বার্থবিরোধী হতে পারে। বাস্তবিকপক্ষে অতিবামপন্থী অনেকে সোস্যাল ডেমোক্রেসি সম্পর্কে মোহমুক্ত হয়ে ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকের অংশগ্রহণের ধারণা সমর্থন করে, রাজনৈতিক পার্টি ও রাজনীতিতে নিন্দুকেরা

অ্যানার্কোসিণ্ডিক্যালিস্ট কোঁকে পরিণত হয়। সেই কারণে আমাদের নির্দিষ্ট প্রস্তাব-রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ কিভাবে হবে—তা হ'ল নির্দিষ্ট শিল্পে শ্রমিকেরা নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থায় এক-তৃতীয়াংশ প্রতিনিধি নির্বাচিত করবে। শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার জন্য ও সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের বিপরীতে এক গোষ্ঠীগত স্বার্থকে বাধা দেবার জন্য সংযুক্ত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণীর দ্বারা আর এক তৃতীয়াংশ নির্বাচিত হবে। ট্রেড ইউনিয়নের ইতিহাসের সঙ্গে যারা পরিচিত, তারা সবাই জানে যে, গোষ্ঠীবাদ কিরকম ক্ষতি করে, শ্রমিকদের মধ্যে কিরকম বিভাজন তারা করে।

কমন মার্কেট প্রস্তাবিত দ্বি-স্তর বোর্ডের বিরুদ্ধে আমরা। আমরা মনে করি যে তত্ত্বাবধায়ক বোর্ড এমন একটি যেখানে শ্রমিকেরা মিলিত হয়ে এক বা বহু বছরের জন্য নীতি নির্ধারণ করে। আসল ক্ষমতা এক্সিকিউটিভ বোর্ডের হাতে, তারা নীতির রূপায়ণ করে।

এখানে আর একটি বিষয় আছে। একজনের মনের সংঘাতকে গুরুত্ব দেওয়া সঙ্গত নয়। যখন আমরা বোর্ডে প্রতিনিধি নির্বাচন করি, তখন আমরা বলি যে, এটা সংগ্রামের বিকল্প নয়, কারণ আমরা পুঁজিবাদী সমাজে কাজ করি। এমনকি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের ব্যবস্থাপক বোর্ডের সাথেও আলোচনায় ক্ষমতা ও সংগঠিত শক্তি প্রয়োগে ট্রেড ইউনিয়নের স্বাধীনতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রয়োজন। পুঁজিবাদী সমাজেও ট্রেড ইউনিয়নগুলো স্বাধীন থাকবে ও তাদের কোন দ্বৈত আনুগত্য থাকবে না। যখন আপনি বোর্ডের সভায় মিলিত হবেন, তখন আপনি কোম্পানির স্বার্থ দেখবেন। যদি আপনি শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করেন, তখন আপনি শ্রমিক স্বার্থ দেখবেন। সেইজন্য যাঁরা ট্রেড ইউনিয়নের আলোচনায় বসবেন, তাঁরা কখনই বোর্ডের সদস্য হবেন না। যদি নির্বাচিত হন, তবে কখনই পুরোপুরি শ্রমিক স্বার্থ তিনি দেখবেন না এবং তাঁর মনে স্বার্থের সংঘাত বাধবে।

পরিশেষে কিছু উদাহরণ দিতে চাই। বর্তমান সময়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হোলো বহুজাতিক সংস্থা, রাষ্ট্র এদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। বহুজাতিক সংস্থার সহযোগী সংস্থার জাতীয় ব্যবস্থাপক বোর্ডের পক্ষে প্রকৃত সিদ্ধান্ত নেওয়া কিভাবে সম্ভব? শ্রমিকরা সংঘর্ষ ও সংগ্রামের মাধ্যমেই কিছু পেতে

পারে এবং তারা এটা দ্রুত বুঝছে। পশ্চিম জার্মানি ও লণ্ডনের ফোর্ড শ্রমিকরা লণ্ডনে মিলিত হয়ে যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নেয়। এক দেশ থেকে অন্য দেশে চাকরি স্থানান্তর রুখতে, পুঁজিবাদী যান্ত্রিকীকরণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ও কাজের অবস্থার মৌলিক উন্নতি ঘটাতে তারা সব কিছু করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাদের অন্যতম সাধারণ লক্ষ্য হোলো নতুন প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগের ব্যাপারে সহযোগিতা ও দেশের তথ্যাদি বিনিময় করা। এই-ভাবে শ্রমিকরা ব্যবস্থাপনার কাজকর্মের ওপর এককভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যবস্থাপনার অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ করছে। এটা এক আর জি-তে ফোর্ডের বোর্ডে শ্রমিকদের থাকার ফলে নয় পরন্তু ফোর্ড ইন্টার ন্যাশনালের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের যৌথ সংগ্রামের ফলে হয়েছে। তারা জার্মানির ফোর্ডকে গ্রেট ব্রিটেনের ফোর্ডের বিরুদ্ধে খেলতে দিতে রাজী নয়।

প্রত্যেকেই জানে যে, ব্রিটিশ ইস্পাত কর্পোরেশন পুরো শিল্পটা নিয়ন্ত্রণের জন্য সংগ্রামরত। একে আরও প্রতিযোগিতামূলক করার জন্য তারা ইউ এস এ থেকে কয়লা আমদানি করছে, যার অর্থ দক্ষিণ ওয়েল্‌সকে আঘাত করা। মর্নিং স্টার-এর একটি প্রবন্ধ আমার সামনে রয়েছে। ওয়েল্‌স্-এর খনি শ্রমিকরা ডক শ্রমিকদের অনুরোধ করেছে, এবং তারা আমেরিকা থেকে আসা কয়লা না নামাতে রাজী হয়েছে। দু-সপ্তাহ ধরে জাহাজ সেখানে ছিল। ব্রিটিশ ইস্পাত কর্পোরেশন খনি শ্রমিকদের সাথে আলোচনায় বসতে বাধ্য হয়েছে। কি ব্যাপারে? কোম্পানি বলে যে তারা আমেরিকা থেকে ১৮০০০ টন ও ওয়েল্‌স্ থেকে ১৮০০০ টন কয়লা নেওয়ার পরিকল্পনা করেছে। ভবিষ্যৎ আমদানির ক্ষেত্রে তারা প্রতিশ্রুতি দেয় যে, ইউনিয়নের সঙ্গে কথা বলে তা ঠিক করা হবে। মজুরি, কাজের সময় ও কাজের অবস্থা ছাড়া সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে এটি একটি দৃষ্টান্ত। শ্রমিকশ্রেণীর সংহতির জন্যই শ্রমিক নিয়ন্ত্রণে একটি সংস্থার অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক নীতি স্থির হচ্ছে। ইস্পাতশিল্পে একজন শ্রমিক ডিরেক্টর আছেন, কিন্তু তিনি কয়লা আমদানি বন্ধ করতে পারেন নি।

এটাই আমাদের মূল দৃষ্টিভঙ্গি। শ্রমিক দ্বারা নিয়ন্ত্রণের সমস্যাকে এভাবে আমরা দেখি।

কমিউনিস্টরা ও জনমত

ডাবলিউ এম আর আলোচনা-চক্র

১৯৭০-এর দশকে দুনিয়ার অ-সমাজতান্ত্রিক অংশের বহু দেশে প্রগতিশীল ও বিপ্লবী শক্তিগুলোর সাফল্য একদিকে যেমন সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া ও সারা বিশ্বের মেহনতি মানুষদের মধ্যে একটা ব্যাপক আন্তরিক সংহতিবোধের সঞ্চার করেছে, তেমনি আবার অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদের শক্তিগুলোর মধ্যে সৃষ্টি করেছে তীক্ষ্ণ নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া। বিশ্ব-জনমতের বিষয়টি এখন তীব্র রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শগত সংগ্রামের ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। একটা সামাজিক বিষয় হিসেবে জনমতের প্রকৃতি ও নানারকম বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে যেসব সমস্যার পরিচয় পাওয়া যায় ঐ সংগ্রামের ক্ষেত্রে সেগুলোর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

আধুনিক জগতে জনমতের গঠন ও তার ভূমিকা সম্বন্ধে এবং এ ব্যাপারে কমিউনিস্টদের দৃষ্টিভঙ্গি কী গত বছর ডাবলিউ এম আর সে সম্পর্কে এক আলোচনা শুরু করেছিল। (ডাবলিউ এম আর, ফেব্রুয়ারী, জুন, অক্টোবর-১৯৭১)। ডাবলিউ এম আর পত্রিকার দপ্তরে কমিউনিস্টরা ও জনমত বিষয়বস্তুটি নিয়ে যে আলোচনা-চক্র বসে তার রিপোর্ট আমরা নিচে প্রকাশ করছি। এখানে ১২টি দেশের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি হিসেবে পার্টির কর্মী ও সমাজবিজ্ঞানীরা যোগদান করেছিলেন। দেশগুলোর নাম: অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, বুলগেরিয়া, চিলি, চেকোস্লোভাকিয়া, ফিনল্যাণ্ড, জি ডি আর, গ্রীস, পোল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

১. সমকালীন সামাজিক-রাজনীতিক কাঠামো-গুলোতে জনমতের প্রকৃতি ও ভূমিকা

আলোচনার উদ্বোধন করে রোল্যাণ্ড বাউয়ের (সি সি-র সদস্য, এস ইউ পি জি, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও সমাজতত্ত্ব গবেষণার ডাবলিউ এম আর কমিশনের সভাপতি) বলেন, আলোচনার বিষয়বস্তুটি শুধু কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলোর কাছেই তাৎপর্যব্যঞ্জক নয়। প্রলেটারিয়েট ও তার

মিত্রদের মধ্যে শ্রেণী-চেতনা সঞ্চারের যে চিরাচরিত দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অথবা শ্রমিক ও অন্যান্য মেহনতি মানুষকে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের পক্ষে নিয়ে আসার জন্যে তাদের মধ্যে যে রাজনৈতিক-আদর্শগত কাজ করার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তার থেকেও একটা নতুন ও ব্যাপকতর আধেয় এখন তাৎপর্যময় হয়ে উঠছে।

অবস্থান, কার্যধারা, গুণধর্ম ও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ও ধনতান্ত্রিক সমাজের জনমত সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। জনমতের গঠন ও কার্যাবলীর ছকও ভিন্ন ধরনের। আর সেই অনুযায়ী সমাজের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক শক্তি জনমতকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখে। একে আয়ত্ত করার ধারা ও পদ্ধতিও দুই সমাজের দুইরকম।

সুনির্দিষ্ট সামাজিক-ঐতিহাসিক অবস্থার উপর সরাসরিভাবে নির্ভর করে কমিউনিস্টরা জনসংখ্যার বিভিন্ন গোষ্ঠীর অবস্থান ও মতামত সম্বন্ধে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি স্থির করে। কিন্তু নিশ্চয়ই এটা শুধু প্রয়োগবাদী দৃষ্টিভঙ্গি হলে চলে না। সামাজিক বিষয় হিসেবে জনমতকে বিজ্ঞানসম্মত ও তত্ত্বগতভাবে আয়ত্ত করা এবং মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সমাজতন্ত্র ও ডায়ালেকটিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদী পদ্ধতিবিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে জনমতের সুগভীর ও সর্বাঙ্গীণ বিশ্লেষণও ঐ দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে থাকা চাই।

আলোচনা-চক্রের বক্তারা বলেন জনমত সামাজিক চেতনার একটা বিশেষ রূপ। সমাজের নানা "ক্ষেত্রের" তাৎপর্যপূর্ণ সমস্যাবলীর মূল্যবোধের সঙ্গে এই সামাজিক চেতনার মিলন ঘটে। সেই কারণে জনমতের প্রকৃতি-বিশ্লেষণে দুটি দিক থাকতে হবে: জ্ঞানতত্ত্বগত দিক (জনমতের বিষয়বস্তু, এর মধ্যে বাহ্য জগতের প্রতিফলন) এবং সমাজতাত্ত্বিক দিক (সামাজিক সত্তা বা অস্তিত্বের দ্বারা জনমতের নির্ধারণ এবং দ্বিতীয়টির উপর প্রথমটির সক্রিয় প্রভাব)।

কারেল রাইশ্চটারিক (সমাজবিজ্ঞানের ডক্টর ও প্রাগে জনমত গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক) জ্ঞানতত্ত্বগত সমস্যাবলীর আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, জনমত গড়ে ওঠে সামাজিক অবস্থার অনুপাতে এবং সাধারণ চেতনা ও তত্ত্বগত চেতনা উভয় স্তরেই এর অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়। এখানেই এর পরস্পর-বিরোধী মর্মবস্তু এবং সত্য ও মিথ্যা, কাল্পনিক জ্ঞানের অস্তিত্ব এর মধ্যে থাকে।

জনমতের মধ্যেকার সাধারণ ও তত্ত্বগত চেতনার সম্পর্কটি ঐতিহাসিক পরিমাপবিশিষ্ট। কোনো সমাজের সামাজিক-অর্থনৈতিক, জাতীয় ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এটার অদল-বদল ঘটে। ধনতন্ত্রে ও সমাজতন্ত্রে এর মূল্য গুণগতভাবে আলাদা। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে জনমত সম্বন্ধে যে গবেষণা হয়েছে তার থেকে এটা দেখা যায় যে, সমাজবিকাশের মূল নীতি ও লক্ষ্যের প্রতি জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশের সময় জনমতের মধ্যে তত্ত্বগত চেতনার বেশ খানিকটা প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

জন পিটম্যান (রাজনৈতিক ব্যুরোর সদস্য, সি পি ইউ এস এ) বলেন, জনমত বিশ্লেষণের সময় এটা খেয়াল রাখতে হবে যে, এটা জনগণের সাধারণ চেতনা, সামাজিক মনস্তত্ত্ব ও প্রভাবশালী ভাবাদর্শগুলোর একটা মিশ্রণ। একদিকে, মতামত, মনোভাব ও নানারকম ঝোঁক মিলিয়েই জনমত, জনগণের সাধারণ চেতনা, কর্ম ও জীবনের অবস্থা সম্পর্কে তাদের দৈনন্দিন প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। কোনোরকম প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ার পূর্বেই শোষণ বা নিপীড়নের উপলব্ধি বা অনুভূতি সংবেদন মতামত বা অনুভূতি রূপে দানা বেঁধে ওঠে। ভাবাদর্শ, সামাজিক ভাবধারা ও ধ্যান-ধারণার মাধ্যমে এগুলো প্রকাশ পায়। "শ্রেণীর চিন্তাশীল প্রতিনিধি" হিসেবে তত্ত্বজ্ঞরা তাঁদের শ্রেণীস্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক সম্পর্ক ও প্রক্রিয়াগুলোকে রূপ দেওয়ার জন্যে ভাবাদর্শ ও ধ্যান-ধারণাকে সুসংবদ্ধ করে তোলেন ও তত্ত্বগতভাবে প্রতিষ্ঠা করেন।

ভি, করোবেইনিকভ (দর্শনের ডি এস সি, সমাজতত্ত্ব গবেষণা পরিষদ, সোভিয়েত বিজ্ঞান অ্যাকাডেমি) বলেন, জনমতের বৈশিষ্ট্যগুলো শুধুমাত্র আত্মিক বিষয় নয়। এটা স্মরণযোগ্য যে, মার্কস জগতকে জানার ক্ষেত্রে তত্ত্বগত (বৈজ্ঞানিক), নান্দনিক, ধর্মীয় ও আত্মিক-প্রয়োগগত পদ্ধতির উল্লেখ করেছেন। জনমতের বিষয়টি নিঃসন্দেহে আত্মিক-প্রয়োগ-গত পদ্ধতির মধ্যে পড়ে এবং এটাই বিষয়টির জটিল কাঠামো উপলব্ধির পথ খুলে দেয়।

জনমত ও মানুষের আচরণের মধ্যে এবং সিদ্ধান্ত ও কর্মের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান প্রয়োগের দিক থেকে সেগুলোর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে এবং এগুলো জনগণের মধ্যে ভাবাদর্শগত ও রাজনৈতিক শিক্ষার কার্য-

কারিতা নির্দেশ করে। এই কারণেই সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ২৫তম কংগ্রেসে এটা উল্লেখ করা হয়েছিল যে, সাম্যবাদ গঠনের জন্যে সাম্যবাদী চেতনায় শিক্ষিত করে তোলা, এই কাজের জন্যে প্রস্তুতি, ইচ্ছা ও সামর্থ্য সৃষ্টির কাজকে পার্টি নিরন্তর গুরুত্ব দেয়।

কুর্ট রাকমান (সি সি পলিট ব্যুরোর এ্যাজিটেশন কমিশনের সদস্য, এস ইউ পি জি) জনমতের সামাজিক চরিত্র বিশ্লেষণ করে বলেন, জনমতের শ্রেণীগত মর্মের বিষয়টি প্রধান গুরুত্বসম্পন্ন। এই কারণেই মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিন গোটা সমাজের জনমতকে বিচার করার বদলে সমাজের আলাদা আলাদা শ্রেণীর জনমতকে বিচার করেছিলেন।

ধনতান্ত্রিক সমাজে জনমতের মর্মবস্তু বৈর শ্রেণীবিরোধকে এবং শাসক শ্রেণী ও নিপীড়িত শ্রেণীগুলোর মধ্যেকার বাস্তব স্বার্থ-বিরোধকে প্রতিবিম্বিত করে। সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর-প্রক্রিয়ার মধ্যে সমাজের সমস্ত মানুষের সমস্বার্থের প্রকাশ ঘটে ক্রমশই সেটা গভীরতা অর্জন করে। এই ধরনের জনমত গড়ে ওঠার ভাবাদর্শগত ভিত্তি সৃষ্টি হয় শ্রমিকশ্রেণীর বিশ্ববীক্ষা থেকেই।

এই কারণেই সমাজতন্ত্রেও জনমতের শ্রেণীচরিত্র বজায় থাকে, যদিও গোটা জাতির জনমত ক্রমশই অভিন্নতা পেতে থাকে।

পলিক্রোনিস তাইস (সি সি সদস্য, গ্রীসের কমিউনিস্ট পার্টি) বলেন, জনমতের শ্রেণীগত মর্মবস্তু সত্ত্বেও সমাজে এমন সব সমস্যা ও বিষয় আছে যেগুলোর ভিত্তি শ্রেণীস্বার্থের চাইতে আরও ব্যাপকতর। বিশেষ করে জাতীয় সমস্যা বলতে আমরা যা বুঝি, তা এই ধরনের। এই জাতীয় সমস্যাবলী বিভিন্নশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত মানুষদের মধ্যে এবং অন্যান্য বিষয়ে ভিন্ন অবস্থান সম্পন্ন বিভিন্ন অংশের মধ্যে একই ধরনের চেতনার সৃষ্টি করে। তবে এটা অবশ্যই মেহনতি মানুষদের ব্যাপক অংশগুলো সম্পর্কে প্রযোজ্য, বুর্জোয়া সমাজের "উপরতলা" সম্পর্কে নয়। নিজের দেশ ও স্বাধীনতার প্রতি অনুরাগ—জাতীয় স্বাধীনার আকাঙ্খা একটা ব্যাপক জনমতকে রূপ দিতে পারে—যার মধ্যে জনমতের বিভিন্ন উপাদান একত্রিত হয়।

এই বক্তব্যটিকে বিশদ করে অধ্যাপক **বরিস গ্রুশিন** (দর্শনের ডি এস সি, ডাবলিউ এম আর-এর কর্মী-সদস্য) বলেন, এই বাস্তবতা থেকেই সামাজিক

চেতনার একটা বিশেষ ধরন হিসেবে জনমতের মাধ্যমের সামাজিক চরিত্রের প্রশ্নটি বেরিয়ে আসে (এই সামাজিক চেতনা আর চেতনার শ্রেণীগত রূপগুলো একই জিনিস নয়, এটা তথাকথিত গণ-চেতনার একটি বিশেষ লক্ষণ)। এই সঙ্গে জনমত ও শ্রেণী-চেতনার মধ্যেকার সম্পর্কজনিত সমস্যাটিও সৃষ্টি হয়।

শ্রমিকশ্রেণী তাদের দৈনন্দিন কাজের মধ্যে যে বাস্তব অবস্থান নেয়—সেই শ্রেণী-চেতনার বৈশিষ্ট্যগুলোকে একত্র করে তুলনামূলক আলোচনা করলে শ্রমিকশ্রেণীর বিভিন্ন ধরনের শ্রেণী-চেতনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ তিনটি প্রধান অবস্থার অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হবে ; (ক) যখন শ্রমিকদের জনমত (বিভিন্ন ঘটনায় তাদের প্রকাশিত মতামত) শ্রেণী-চেতনার সঙ্গে মিলে যায় এবং জনমতটি হয়ে ওঠে শ্রেণী-চেতনার প্রত্যক্ষ প্রকাশ ; (খ) যখন জনমতের পার্থক্য ঘটে শ্রেণী-চেতনা থেকে কিন্তু মোটামুটিভাবে তার সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকে এবং শ্রেণী-চেতনার দ্বারা নির্ধারিত হয় ; (গ) যখন জনমতের সঙ্গে শ্রেণী-চেতনার স্পষ্টবিরোধ ঘটে এবং জনমতের সঙ্গে শ্রেণী-চেতনার বৈর সম্পর্ক দাঁড়িয়ে যায়। শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে জনমতের এই তিনটি "ক্ষেত্রের" পারস্পরিক সম্পর্ক। তাদের মাত্রা ও নির্দিষ্ট গুরুত্ব থেকে প্রলেটারিয়েটের শ্রেণী-চেতনা ও আত্মসচেতনতা সৃষ্টির বিপ্লবী শিক্ষায় মার্কসবাদীরা, কমিউনিস্টরা কতটা সফল হয়েছে তা উপলব্ধি করা যায়। অন্যদিকে ঐগুলো এখনও যেসব বড়ো সমস্যা রয়েছে তাদের পরিমাণ ও গভীরতাকেও তুলে ধরে।

জনমতের সীমা বা অন্য কথায়, জনমত বলতে কী বোঝায়—এটা একটা যৌথ সিদ্ধান্তমূলক বিষয় কি না—এ সব সম্বন্ধেও প্রাণবন্ত আলোচনা চলে। জনসাধারণের প্রকাশিত মতামতের যাথার্থ্য প্রসঙ্গেও ঐ প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়।

আলেজ লরোস্কি (রাজনীতির ডি এস সি, ধনতন্ত্রের সমকালীন সমস্যাবলীর ইনস্‌টিটিউট-এর পরিচালক, পোলাণ্ড) বলেন, জনগণের সামাজিক ও রাজনীতিক সক্রিয়তায় আতংকিত বুর্জোয়া রাজনীতিক ও তত্ত্বজ্ঞরা জনমতের বিষয়টির সামাজিক ভিত্তিকে সংকীর্ণ করে তোলার জন্যে, তথাকথিত যোগ্য-ব্যক্তি যেমন রাজনীতিবিদ, সামরিক লোকজন, "চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী", বৃহৎ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মুখপাত্র এবং প্রচার মাধ্যমের কর্মী প্রভৃতি "বিশেষজ্ঞ-

দের" একটা চক্রের মধ্যে এটাকে আবদ্ধ করে রাখার জন্যে নানারকম ফন্দিফিকির করছে। সেই কারণেই বুর্জোয়া সমাজতত্ত্বে মোটামুটিভাবে এটাই স্বীকৃত যে জনমতের ব্যাপারটা উপর তলার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ব্যাপার এবং রাজনীতি, অর্থনীতির জটিল সমস্যাবলী নিয়ে মেহনতি মানুষ স্বাভাবিক-ভাবেই কোনো মতামত দিতে অক্ষম। কিন্তু ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর ব্যাপক জনতম যাচাইয়ের রীতির সঙ্গে এই ধারণাটি খাপ খায় না। কারণ ঐসব দেশের জনমত সমগ্র জনসংখ্যার মতামত পর্যন্ত বিস্তৃত।

কিন্তু তা সত্ত্বেও **ওয়াই জর্জিয়েভ** (বি সি পি, সি সি-র বিকল্প সদস্য ও বি সি পি-র সমাজতান্ত্রিক তথ্যকেন্দ্রের প্রধান) এবং **ওয়াইয়েন্স ক্লিমজ্যাক** (পত্রিকায় পোলিস পার্টির প্রতিনিধি) ও অন্যান্যদের মতে যোগ্যতার প্রশ্নটি থেকেই যাচ্ছে, শুধু তাই নয়, সেটাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণও বটে। জনগণের বিভিন্ন গোষ্ঠীর নানা সমস্যার আলোচনায় স্বাভাবিকভাবেই ভিন্ন ভিন্ন উপলব্ধির মাত্রা প্রকাশ পায় এবং ঐসব সমস্যার সৃষ্টিশীল সমাধানে তারা সমানভাবে অংশ নিতে পারে না। তাই এর থেকে প্রমাণ হয় যে জনমত নানা স্তরে বিভক্ত। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে কমিউনিস্ট পার্টি ব্যাপক সংখ্যক জনসাধারণের যোগ্যতা ও চেতনা উন্নত করার জন্যে অনবরত প্রভূত পরিমাণ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও কারিগরি শিক্ষার এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনায় তাদের ব্যাপক অংশগ্রহণের জন্যে কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু গবেষক ও প্রশাসনিক সংস্থার কাছে অনুপযুক্ত মতামতও নিঃসন্দেহে আগ্রহের বিষয় (এমনকি সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও), বিশেষ করে গণ-চেতনার প্রকৃত অবস্থা বিচার করার দিক থেকে। এর অর্থ হলো যোগ্যতার মানদণ্ডটি (তার সমস্ত গুরুত্ব সত্ত্বেও) জনমতের সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা চলে না। যেহেতু জনগণের যোগ্য ও অযোগ্য অংশের আকার ও গঠন প্রকৃতি অনবরত পরিবর্তনশীল, তাই যোগ্যতা একটা আপেক্ষিক ব্যাপার—সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টির উপর নির্ভরশীল।

জান ডেব্রোওয়্যার (পলিট ব্যুরোর সদস্য, বেলজিয়াম কমিউনিস্ট পার্টির সি সি-র আন্তর্জাতিক বিভাগের প্রধান) বলেন, অনুরূপভাবে মতামত সম্পর্কে সচেতনতার মানদণ্ডটিও ব্যর্থ হবে যদি উপরোক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হয়। বিশেষ করে, প্রকৃত জনমতের মধ্যে সবসময়েই সচেতনার বিভিন্ন

মাত্রাবিশিষ্ট ব্যক্তিগত মতামতও থাকে। এর মধ্যে এমন মতামতও থাকে যা সচেতনভাবে করা হয় না। নির্বাচনের মতো নানা ধরনের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে সেগুলো বেশ বাস্তবভাবেই প্রকাশ পায়।

আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা ডাবলিউ এম আর প্রকাশনীগুলোতে প্রকাশিত এই বক্তব্য সমর্থন করেন যে, বর্তমান সমাজে জনমতের ভূমিকা লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। একথা বলার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে যে, বিংশ শতাব্দী, বিশেষ করে তার দ্বিতীয়ার্ধের একটা বৈশিষ্ট্য হলো জনমতের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার এই গুণগত পরিবর্তন: বেশির ভাগ রাষ্ট্রের জীবনে এ একটা অপরিহার্য, নিরন্তর ক্রিয়াকলাপ এবং অত্যন্ত কার্যকর উপাদান হয়ে উঠছে। সামাজিক ব্যবস্থাপনার শীর্ষতম স্তর পর্যন্ত সমস্ত ক্ষেত্রে রাজনৈতিক, ভাবাদর্শগত ও অন্যান্য সিদ্ধান্ত সূত্রায়িত করা ও নির্ধারণের ক্ষেত্রে জনমত ক্রমশই সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করছে।

বক্তারা এইসঙ্গে এটাও বলেন যে, মার্কসবাদী বিশ্লেষণ শুধু সাধারণ বিবৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের বিভিন্ন সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক-ভাবাদর্শগত কাঠামোর মধ্যে জনমতের প্রকৃত সম্ভাবনা, রূপ ও সীমা সুনির্দিষ্ট করার কাজেও মার্কসবাদী বিশ্লেষণকে ব্যবহার করতে হবে।

ভাইস বলেন, বিশেষ করে এটা দেখতে হবে যে, সমাজতান্ত্রিক সমাজে রাষ্ট্রের নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়াসে ও সাহায্যে জনমতের ক্রমবর্ধমান ভূমিকাকে আরও অতিরিক্ত উৎসাহ যোগানো হচ্ছে। আর ধনতন্ত্রে এর বিপরীতটাই ঘটছে। সেখানে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র জনমতের ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে সবরকমে দাবিয়ে রাখতে চায়। কারণ একচেটিয়া বুর্জোয়ারা যেসব সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে স্বভাবতই তাদের কাজ হলো ঐ বুর্জোয়া স্বার্থ অনুসরণ করা।

আধুনিক সমাজের জীবনে জনমতের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের পেছনে যে সব উপাদান বর্তমান সেগুলোর প্রতি আলোচনা-চক্রে অংশগ্রহণকারীরা বিশেষ নজর দেন। আলোচনা থেকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বেরিয়ে আসে:

—সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভব ও বিকাশ থেকে এবং বিশ্বের বিভিন্ন অংশের এতদিনের বিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নতুন শক্তি সমাবেশ

ঘটেছে, বিভিন্ন দেশ, অঞ্চল ও গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে যোগাযোগ প্রসারিত হয়েছে, তথ্যের বিনিময় চলেছে এবং এমন সব প্রক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে যেগুলো শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও দেঁতাতের কর্মনীতির মধ্যে বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করেছে ;

—বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লব প্রসারিত হওয়ার ফলে জনগণের মধ্যে শিক্ষার উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটেছে, সামাজিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে জনসাধারণের মধ্যে উচ্চমানের তথ্য জানতে পারা সহজ হয়েছে এবং এর পরিণতি স্বরূপ বৃদ্ধি পেয়েছে তাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক কার্যকলাপ ;

—সুগভীর প্রক্রিয়াগুলো আধুনিক সমাজ-জীবনের কার্যত প্রতিটি ক্ষেত্রকে পরস্পরের সঙ্গে সংহত করে ফেলছে এবং তারফলে জনগণের ভূমিকা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। জনগণের ভূমিকার এই বৃদ্ধি ঘটছে শুধু বিষয় হিসেবে নয়, ঐতিহাসিক, সামাজিক ক্রিয়া এবং ফলপ্রসূ সামাজিক ব্যবস্থাপনার কলা-কৌশলের বিষয় হিসেবেই নয়, বিষয়ী হিসেবেও।

যোহান ভন বনসডফ' (ফিনল্যাণ্ড কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির আন্তর্জাতিক বিভাগের সদস্য এবং ফল্‌ক্‌তিডনিন গেন নাই তিড্‌ পত্রিকার প্রধান সম্পাদক) বলেন, যে সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থার মধ্যে জনমত তার ভূমিকা পালন করে সেই অবস্থা অনুযায়ী ঐসব প্রতিটি উপাদানের গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে হবে। উদাহরণ-স্বরূপ, জনগণের কার্যকলাপের উপর শিক্ষা-প্রসারের যে সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, আসলে সেটা প্রধানত নির্ভর করে কোনো সমাজের শিক্ষা-ব্যবস্থার নির্দিষ্ট সামাজিক প্রকৃতির উপর।

জর্জিয়েভ সমাজতন্ত্রের অধীনে জনমতের ক্রমবর্ধমান ভূমিকার অন্তর্নিহিত উপাদানগুলোর সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তাঁর মতে এগুলো হলো: জনগণের শিক্ষাগত,সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক মান—এই উপাদানগুলো জনগণের কার্যকলাপের ক্ষেত্র প্রসারিত করে এবং এমন সব সমস্যা সৃষ্টি করে যেগুলোকে কেন্দ্র করে সুষ্ঠুভাবে জনমত প্রকাশ করা সম্ভব, গণ-প্রচার মাধ্যমের বিকাশ—যার ফলে জনগণের প্রাপ্ত তথ্যে সুনিশ্চিতভাবে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে, সমাজতান্ত্রিক দেশের আর্থনীতিক ও রাজনীতিক জীবনে যৌথ কর্মের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব ; এবং সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের অধিকতর বিকাশ—যার তাৎপর্য হলো সামাজিক বিষয়গুলো পরিচালনার ক্ষেত্রে জনগণের আরও সক্রিয় অংশগ্রহণ।

২ জনমতের রূপায়ণ, ভূমিকা ও অনুশীলন

আলোচনা-চক্রের বক্তারা বলেন জনমত গঠনের জন্য সংগ্রাম এখন বর্তমান শ্রেণীসংগ্রাম ও ভাবাদর্শগত সংগ্রামের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। সারা দুনিয়ার ক্ষেত্রে এর নির্দিষ্ট মর্মবস্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিষয়গুলোর সঙ্গে জড়িত, যেমন, দেঁতাতের জন্যে জনগণের সংগ্রাম, বিশ্বের অগ্রগতির ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলোর আরও উন্নতর ভূমিকা এবং উন্নত ধনতান্ত্রিক ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর সামাজিক মুক্তি ও জাতীয় মুক্তি। মতামত, মূল্যবোধ ও রীতিনীতির সুস্পষ্ট সামাজিক ঝোঁকের মধ্যে দিয়ে এই সংগ্রাম প্রকাশ পাচ্ছে। পরস্পর-বিরোধী সামাজিক-আর্থনীতিক ব্যবস্থা-গুলো ঐসব মতামত ও মূল্যবোধকে ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চায়। বিভিন্ন দেশে কোন্ কোন্ প্রশ্ন ও বিষয় নিয়ে জনমতকে আকৃষ্ট করা যাবে এবং এই প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত পদ্ধতি ও উপায়ের প্রকৃতি কী তা নিয়েও এই সংগ্রাম চলে।

লরোস্কি বলেন, জনমত গঠনের একটা মুখ্য পদ্ধতি হলো বিশ্বের বিভিন্ন ঘটনা ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে জনগণকে তথ্যের যোগান দেওয়া। ধনতন্ত্রের আওতায় শাসকশ্রেণীগুলো ধনতান্ত্রিক দেশ ও অন্যান্য দেশের ভিতরকার বাস্তবতাকে বিকৃত করা এবং একপেশে চিত্র উপস্থিত করার জন্যে এই পদ্ধতিকে সুকৌশলে কাজে লাগায়।

এখানে সত্য ও গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক তথ্যকে গোপন করা ধনতান্ত্রিক সমাজের সংস্থাগুলোর অন্যতম একটি পদ্ধতি মাত্র। এই সব সংস্থাই জন-সাধারণের মধ্যে মতামত ও ভাবধারা গঠনের ক্ষেত্রে প্রধানত কাজ করে।

আলফ্রেড মাটজিঙ্গার (সি সি সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, অস্ট্রিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি), **ব্রুনো ফার্চ** (সি সি সদস্য, অস্ট্রিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি) ও অন্যান্যরা এটা দেখান যে, এইসব সংস্থা তাহা মিথ্যাকেও যেমন ব্যাপক-ভাবে ছড়িয়ে দেয়, তেমনি তথ্যকেও স্থূল বা সূক্ষ্মভাবে বিকৃত করে।

এই প্রসঙ্গে, ধনতান্ত্রিক সমাজে শাসকশ্রেণীগুলো গণ-চেতনাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে যেসব উপায়-উপকরণ ব্যবহার করে সেগুলো এবং এই নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা কতটা বিস্তৃত সেসবও এই আলোচনা-চক্রে বিবেচিত হয়।

রাকমান বলেন, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা সব সময়েই হিংসা ও প্রতারণার আশ্রয় নেয়। প্রতারণার ব্যাপারটি জনসাধারণের চেতনা নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে জড়িত। এই নিয়ন্ত্রণের অর্থ হলো প্রকৃত বাস্তবতার বিকল্প হিসেবে একটি ছদ্মাবরণ সৃষ্টি করা। এই কার্যকলাপের প্রধান উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য নিহিত রয়েছে চেতনার স্তরে ধনতান্ত্রিক সমাজের সঙ্গে মেহনতি মানুষদের সংহত করে ফেলা এবং এইরকম একটা ধারণার সৃষ্টি করা যাতে মনে হয় এইরকম মানুষেরা সমাজতন্ত্রের ভাবধারা ও প্রয়োগের প্রভাব থেকে মুক্ত। তাই ধনতান্ত্রিক প্রচার-মাধ্যম এবং বিভিন্ন শিক্ষা ও প্রচার-সংস্থাগুলোর চেতনা-নিয়ন্ত্রণমূলক কাজকর্মের পরিধি খুবই বিস্তৃত।

সমাজতন্ত্রে এর বিপরীতটাই ঘটে। জনগণকে প্রতারিত করা এবং বাস্তবতার অলীক প্রতিমূর্তি হাজির করা নীতিগতভাবে সমাজতন্ত্রের প্রকৃতি-বিরোধী, সমাজতান্ত্রিক সমাজে জনমত গঠন সমাজতান্ত্রিক চেতনাকে বিকশিত করার এবং রাজনীতিক কাজকর্ম ও নাগরিক কর্তব্যবোধের মনোভাবে মেহনতি মানুষের সাম্যবাদী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলারই একটি অঙ্গ।

বক্তারা আরও বলেন, ধনতান্ত্রিক সমাজে চেতনা নিয়ন্ত্রণ একটি অকাট্য তথ্য এবং বর্তমান সাম্রাজ্যবাদের ভাবাদর্শগত কাজের মৌল বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এই কাজের প্রকৃত সীমা ও বাস্তব ফলাফল সম্বন্ধে সতর্ক বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

প্রথমত, ভাবাদর্শগত পরিচালন-ব্যবস্থা সমেত অসংখ্য ধনতান্ত্রিক সংস্থা শুধুমাত্র চেতনা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে জনমত সম্বন্ধে উৎসাহী নয়। এর আরও একটি ভিত্তি হলো অন্যান্য সমস্যা, বিশেষ করে সামাজিক-রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শগত গোয়েন্দাগিরির সঙ্গে জড়িত সমস্যাবলী মোকাবিলার জন্যে শাসকশ্রেণীর আগ্রহ।

দ্বিতীয়ত, ডেব্রোওয়্যার ও মাটিজার বলেন, ধনতন্ত্রে বুর্জোয়া প্রচারের সাহায্যে জনমতকে ব্যাপকভাবে বিকৃত করা হয়—এর থেকে এটা প্রতিপন্ন হয় না যে, তার ফলে আমাদের সবসময়েই একটা "ভেজাল দেওয়া" গণ-চেতনা নিয়ে কারবার করতে হয়। ধনতন্ত্রের চেতনা নিয়ন্ত্রণী ক্ষমতা অসীম নয়, কারণ জনমত শুধু প্রধান প্রভাবশালী ভাবাদর্শের প্রতিবিম্ব নয়, ধন-

তন্ত্রের সহজাত তীব্র দ্বন্দ্বের প্রতিবিম্বও বটে। এর অর্থ হলো এটা নিরন্তর শ্রেণীসংগ্রামের ক্ষেত্র।

আলোচনা চক্রের পরবর্তী আলোচ্য বিষয় ছিল আধুনিক ধরনের সমাজে জনমত গঠনের উপাদান ও উৎসগুলো।

রাকমান বলেন, মতামত ও প্রবণতা গড়ে ওঠার ব্যাপারটা বস্তুত কখনই নিছক স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়া ছিল না—আর হতেও পারে না। কারণ যেকোনো মতামতের রূপ চেতনার সক্রিয়কর্মের ফল। বর্তমান পরিস্থিতিতে গণ-মতের সৃষ্টি ও প্রসার ঘটে প্রধানত অসংখ্য সামাজিক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যমুখী কর্ম থেকে। তাদের সরবরাহ-করা তথ্যের সামনে মানুষ খানিকটা পরিমাণে তার স্বাধীনতা বজায় রাখে। বিশেষ করে সে তার স্বাধীনতা বজায় রাখে তার পছন্দমতো তথ্যাদি বাছাই করার ক্ষেত্রে সেগুলো গ্রহণ বা বর্জনের মধ্যে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে জনমতের গঠন বৈশিষ্ট্য পায় একটা ভিন্ন প্রবণতার দ্বারা: সেটা হলো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীগত অভিজ্ঞতা থেকে যে মতামত সৃষ্টি হয় তার থেকে ক্রমশই সরে গিয়ে "বাইরের" অভিজ্ঞতা গ্রহণ।

এন. বোকারেভ (দর্শনের ডি. এস-সি, সোভিয়েত বিজ্ঞান-অ্যাকাডেমির সমাজতত্ত্ব গবেষণা সংস্থা) ও অন্যান্যেরা আধুনিক প্রচার মাধ্যমের (যারা সত্যিকারের বিপুল "বহন ক্ষমতার" অধিকারী) অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। সুতরাং গণ-চেতনার অগ্রগতির দিক নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রচার মাধ্যমগুলোর প্রচণ্ড সামাজিক গুরুত্ব রয়েছে।

বক্তারা সংবাদপত্র, রেডিও ও টেলিভিসনের পরিধি ও বিপুল কার্য-কারিতা সম্বন্ধে অনেক তথ্য পরিবেশন করেন। কিন্তু প্রচার-মাধ্যম একটা সর্বশক্তিমান বাহন—এ সম্পর্কেও তাঁরা সংশয় প্রকাশ করেন। এই ধারণাটি ১৯৫০-এর দশকে বুর্জোয়া সমাজতত্ত্বে প্রথম প্রচার করা হয়। এটাকে বিচার করে দেখা ও সংশোধন করা প্রয়োজন। প্রচার-মাধ্যম যে একটা শক্তিশালী বাহন সেটা ঠিকই, কিন্তু এটাই সব নয়। কারণ আজকের দুনিয়ায় জনমত গড়ে উঠছে সামাজিক-আর্থনীতিক, ভাবাদর্শগত ও রাজনৈতিক পরিবেশের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে।

পিটম্যান বলেন, গত দুই দশকে মার্কিন জনমতে এমন একটা পরিবর্তন এসেছে যার সম্ভাবনা বিরাট তাৎপর্যময়। এই পরিবর্তনকে সামনে রেখে

গত আগস্ট মাসে অনুষ্ঠিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টির ২২তম জাতীয় কনভেনসন থেকে বলা হয়েছে এখন সংখ্যাগরিষ্ঠের মনোভাব শান্তির পক্ষে এবং বিপুল সামরিক ব্যয়ের বিরুদ্ধে, অধিকাংশ মানুষ চায় মুদ্রাস্ফীতি ও মেহনতি মানুষের উপর থেকে নিপীড়নমূলক কর প্রথার অবসান, অধিকাংশ মানুষ বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে। এইসব পরিবর্তনের একটা শ্রেণী চরিত্র রয়েছে। একচেটিয়া পুঁজিপতি ও রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান শোষণ ও নিপীড়নের, বিভিন্ন স্তরের ব্যাপক সংখ্যক মানুষের কাজের অবস্থা ও জীবনযাত্রার মানের ক্রমাবনতির বিরুদ্ধে এ এক ব্যাপক প্রতিক্রিয়া। যদিও জনগণের মতামত, ভাবধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি গঠনের উপর সামাজিক আর্থনীতিক প্রক্রিয়াগুলোর প্রভাব পড়ে একটা জটিল মাধ্যমের সাহায্যে।

ডেব্রোওয়্যার তাঁর বক্তব্য এর সঙ্গে সংযোজিত করে বলেন, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ক্ষুরধার সংকট বিরাটভাবে প্রভাবিত করে ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর জনমতের উপর। অন্যান্য বিষয় ছাড়াও এর ফলে রাজনীতিতে নিরুৎসাহের প্রবণতা সৃষ্টি হয় এবং জনগণের কয়েকটি অংশের মধ্যে রাজনৈতিক ঔদাসীন্য ছড়িয়ে পড়ে। তাই জনমত গঠনের ক্ষেত্রে কতকগুলো নতুন ঘটনার সৃষ্টি হয়। এর মধ্যে একটি ঘটনা অত্যন্ত বিপজ্জনক সম্ভবনায় পরিপূর্ণ। দৃষ্টান্তস্বরূপ আকর্ষণী ক্ষমতাসম্পন্ন নেতাদের ক্রমবর্ধমান ভূমিকার কথা উল্লেখ করা যায়। বেলজিয়ামের টিণ্ডেম্যানস অথবা এফ আর জি-র ফ্রানজ জোসেফ স্ট্রস জনগণের মধ্যে ক্ষমতাবান হয়ে উঠেছেন। কিন্তু কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচীর তাদের এই ক্ষমতার উৎস নয়, বরং কর্মসূচীহীনতাই তাঁদের ক্ষমতাবান করে তুলেছে। কর্মসূচীর বদলে তাঁরা হাজির করেছেন কতকগুলো চাঞ্চল্যকর স্লোগান।

জোসে মিগুয়েল ভারাস (চিলির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য) জনমত গঠনের কাজে সংস্কৃতির ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন। ফ্যাসিস্ট কু-র আগে জনগণের মধ্যে তাঁর পার্টি যেসব কাজ করেছিল তার বিস্তারিত বিবরণ দেন। তাঁর বিবরণের মধ্যে ছিল সাংস্কৃতিক ও নন্দনতাত্ত্বিক বিষয়, যেমন কাব্য, সঙ্গীত, নাটক এবং পেশাদার শিল্পী ও জনগণের শিল্পকর্ম কিভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, তার বর্ণনা। তিনি সিদ্ধান্ত করেন, কয়েকটি পরিস্থিতিতে, বিশেষ করে যেসব পরিস্থিতি জাতীয় জীবনের চিরাচরিত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে

সম্পর্কিত, নন্দনতাত্ত্বিক সংস্কৃতির উপাদানগুলোর গণ-প্রচার মাধ্যমের সমান গুরুত্বপূর্ণ, এমনকি তার চাইতেও বেশি ভূমিকা রয়েছে রাজনৈতিক গণ-চেতনা সৃষ্টির ক্ষেত্রে।

জনমত সৃষ্টির ক্ষেত্রে ব্যক্তির সামাজিক ও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যেকার সম্পর্কের প্রশ্নটি আলোচনা করে করোবেইনিকভ বলেন, আমাদের অবশ্যই প্রথমটিকে বেছে নিতে হবে। কিন্তু ক্লিমজাক বলেন, প্রত্যক্ষ পরিবেশ ও নানারকম গোষ্ঠীর উপর মানুষের ব্যক্তি-চেতনা ও তার প্রভাবের বৈশিষ্ট্য-গুলোর সঙ্গে জড়িত "দ্বিতীয়" উপাদানগুলোর ফলাফলের প্রতি নজর দেওয়াও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ, পোলাণ্ডের সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, পরিবারও এক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেইজন্যে সমাজের রাজনৈতিক-সামাজিক বিকাশ সম্বন্ধে কাজ করতে গিয়ে পোলিশ পার্টি তার বিগত কয়েক বছরের দলিলে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে পরিবার প্রতিষ্ঠানটির গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছে।

জনমতের কার্যকলাপ সংক্রান্ত সমস্যাবলীর মধ্যে সামাজিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে জনগণের ভূমিকার উপর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়।

বক্তারা বলেন, এই পটভূমিতে ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক সমাজের অবস্থার মধ্যে যে মৌল পার্থক্য রয়েছে সামাজিক ব্যবস্থাপনার সংস্থাগুলোর উপর তার প্রভাব পড়ে।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকারি উদ্দেশ্য (শাসকশ্রেণীগুলোর দ্বারা নির্ধারিত) ও ব্যাপক জনগণের স্বার্থের মধ্যে অর্থাৎ "শাসক" ও "শাসিতের" মধ্যে ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বের লক্ষণীয় বিকাশ ঘটে। এটা জনমতের প্রতি ক্ষমতার সংস্থাগুলোর দৃষ্টিভঙ্গি ও সেসব পদ্ধতিতে জনমত গৃহীত হয় এবং ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার ব্যবহারিক কাজে ব্যবহৃত হয় তার উপর একটা স্পষ্ট ছাপ ফেলে।

বাস্তব সামাজিক সংঘর্ষে যখন জনগণের কয়েকটি "ক্ষেত্র" প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার বিভিন্ন উপাদানের বিরোধিতা করে, সেই সময় ধনীকশ্রেণী তার নিপীড়নের সুপরিকল্পিত পন্থার আশ্রয় নেয়, আর্থনীতিক ও পুলিসী নিপীড়নের হাতিয়ার নিয়ে জনগণের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালায়। এর ফলে একটা

ক্ষণস্থায়ী "শান্তি" প্রতিষ্ঠিত হয় মাত্র। সেই জন্যেই আজকের ধনতন্ত্র তার কর্মনীতি ও কর্মকৌশল পরিবর্তন করছে—জনমতকে মোকাবিলার জন্যে ব্যাপক আকারে বিভিন্ন ধরনের উপকরণকে কাজে লাগাচ্ছে।

গ্রুসিন তাঁর আলোচনায় বলেন, জনমতের ব্যাপারে শাসকশ্রেণী-গুলোর এমন কতকগুলো পদ্ধতি রয়েছে যেগুলো স্পষ্টতই "রক্ষণশীল", এগুলোর উদ্দেশ্য হলো গণ-অসন্তোষকে দূর করা বা প্রতিরোধ করা। (শিক্ষা, সংস্কৃতি, তথ্য ও প্রচারের মাধ্যমে উদ্দেশ্যমূলকভাবে গণ-চেতনার মগজ ধোলাই করা হয়। আরও এমন সব অসংখ্য পদ্ধতি রয়েছে যেগুলোকে জনমতের দাবি ও প্রয়োজন মেটানোর কাজে এবং জনমতের কাজকর্ম ও প্রকাশের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে নানারকম "নির্গম পথ" ও মতলব হাসিলের উপায়কে কাজে লাগানো হয়)। এই সঙ্গে জনমতের সঙ্গে কারবার করার সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ধনতান্ত্রিক সমাজের শাসকশ্রেণীরা বহুদিন আগেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, জনসাধারণের ব্যাপক অংশের কাজকর্মের সঙ্গে বিভিন্নভাবে যুক্ত পরিচালন-প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত ব্যবহার করার মতো "বাস্তব" সমস্যাবলী সমাধানের কাজেও জনমতকে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই ভিত্তিতেই রাজনীতি, সংস্কৃতি ও সমাজজীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে জনমতকে ভালোভাবে কাজে লাগানোর জন্যে একগাদা সূত্র উদ্ভাবন করা হয়েছে।

আলোচনা প্রসঙ্গে বক্তারা বলেন, কিন্তু এই মূল্যায়নের একটা গুরুতর সীমাবদ্ধতা আছে। তার মধ্যে প্রধান হলো, ধনতান্ত্রিক পরিচালন ব্যবস্থায় জনমতের কোনোরকম অংশগ্রহণ শাসকশ্রেণীর সদিচ্ছার ফল নয়, প্রগতিশীল জনমতের সংগ্রামের ফলে সামাজিক বিরোধের মীমাংসায় পরিচালন সংস্থা-গুলোর বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রামের ফলেই এটা ঘটতে পারে।

সমাজতন্ত্রে জনমত ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সামাজিক-আর্থ-নীতিক পরিকল্পনার মধ্যেকার সম্পর্কগুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন অধ্যাপক জিবিগনিউ সফিন (সমাজতত্ত্বের ডক্টরেট, পোলিশ পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মৌল সমস্যাবলীর ইন্সটিটিউট-এর পরিচালক)। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেন, বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে জনমতের গবেষণা থেকে এখনও এমন জ্ঞান অর্জিত হয়-নি যাতে প্রাসঙ্গিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ

করা যায়। কারণ কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হলে বিষয়গুলোর বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অনেক তথ্য হাতে থাকা চাই। কিন্তু তিনি এটাও বলেন যে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সামাজিক-আর্থনীতিক প্রক্রিয়াগুলো পরিচালনার জন্যে সমাজতন্ত্রে যে কোনো সমস্যাগুলোর বিষয়ীগত মূল্যায়ন নিয়ে গবেষণা একান্ত অপরিহার্য।

সমাজতন্ত্র এমন একটা সমাজ যেখানে কোনো মীমাংসাতীত শ্রেণীদ্বন্দ্ব নেই, এখানে জনগণ নৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ। যে কোনো সামাজিক মূল্যায়ন, তা সমালোচনামূলক হলেও, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে স্বীকার করে নেওয়ার ভিত্তিতেই করা হয়। যে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটি এখানকার জনমতের ভূমিকাকে নির্ধারণ করে তবে তা হলো, ক্ষমতার সংস্থাগুলোর প্রতি জনগণের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনার ধারা ও পদ্ধতির উপর প্রগাঢ় আস্থাবোধ। সেই জন্যেই মানুষের মতামত, চাহিদা ও স্বার্থ তুলে ধরার মতো অনেক পদ্ধতিই সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে এবং এগুলোর সামান্যীকরণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের বিচার-বিবেচনা করার ব্যবস্থাও এখানে আছে।

এমনকি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেও জনমতে এমন কোনো একটি রূপ নয়, যেখানে ক্ষমতা প্রয়ুক্ত হয় বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এর প্রত্যক্ষ প্রভাবও নেই। কিন্তু এখানে এটা এই প্রক্রিয়ার মৌল ও অপরিহার্য উপাদান।

বক্তারা বলেন, প্রতিটি কমিউনিস্ট পার্টি জনমত গঠন, তার সুষ্ঠু ভূমিকা ও জনমতের অনুশীলন করার বহুমুখী কার্যকলাপের ক্ষেত্রে স্বভাবতই তাদের স্ব-স্ব অবস্থা বিবেচনা করে দেখে।

বন্‌স্‌ডর্ফ বলেন, বিশেষকরে ধনতান্ত্রিক দেশে এই ধরনের কাজকর্মে কমিউনিস্টদের বহু কঠিন বাধার সম্মুখীন হতে হয়, এমনকি কমিউনিস্ট পার্টি (ফিনল্যাণ্ডের কমিউনিস্ট পার্টির মতো) যদি সরকারের অংশীদারও হয়। এইরকম একটি সমস্যা হলো কোয়ালিশনের সমস্যা অন্যান্য পার্টির আলাদা মতামতগুলোকে কমিউনিস্টরা কিভাবে ব্যাপক জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে পারে। গণ প্রচার-মাধ্যমের মূল মাধ্যমগুলোর উপর কমিউনিস্টদের নিয়ন্ত্রণ না থাকায় কমিউনিস্টদের যথার্থ কর্মনীতি সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে খানিকটা জটিলতা সৃষ্টি হয় এবং প্রায়ই বিভ্রান্তি দেখা দেয়।

মাটিঙ্গার অস্ট্রিয়ার কমিউনিস্ট পার্টিকে যে বিশেষ অবস্থার মধ্যে কাজ করতে হয়, সে সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, আমাদের দেশে রেডিও এবং টেলিভিসন রাষ্ট্রের দখলে। তারা প্রকাশ্যেই কমিউনিস্ট-বিরোধিতার নীতি অনুসরণ করে। শুধু যে তাদের প্রচারিত বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রেই এটা প্রকাশ পায় তাই নয়, এর ফলে অস্ট্রিয়ার পার্টি মুখ্য প্রচার মাধ্যমগুলো থেকে কার্যত বঞ্চিত রয়েছে। পত্রপত্রিকার জগতে এখন ব্যাপক আকারে তথাকথিত স্বাধীন লেখাপত্র বেরুচ্ছে। সেগুলোতে কমিউনিস্টরা এমনকি বিজ্ঞাপনের মাধ্যমেও তাদের মতামত প্রকাশের সুযোগ পায় না। অবশ্য পার্টির একটা কেন্দ্রীয় সংবাদপত্র রয়েছে এবং পত্রিকার স্থানীয় সংস্করণ প্রকাশ করে। রাজনৈতিক ও শিক্ষামূলক কাজের ক্ষেত্রে পার্টি মৌখিক প্রচারের উপর জোর দেয়। বুর্জোয়া প্রচার-মাধ্যমের চাইতে এটা দুর্বল।

ভিসিউজ সেমে (দক্ষিণ আফ্রিকা) একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিস্থিতির বিবরণ দেন। তিনি বলেন, পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোতে যেসব সীমাবদ্ধ সুযোগ-সুবিধা কমিউনিস্টরা পায়, এখানে তাও নেই। গোপন অবস্থার মধ্যে তাদের কাজ করতে হয় এবং এর ফলে পার্টির কাজের পদ্ধতি, রূপ ও বিষয়বস্তু সম্বন্ধে অনেক বিশেষ ধরনের সমস্যা দেখা দেয়।

এর মধ্যে প্রধান সমস্যা (এই বিষয়ে) হলো লাগাতার ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাসের পরিবেশে জনগণের শ্রেণীচেতনার মানকে কিভাবে উন্নত করা যায়। দক্ষিণ আফ্রিকার নিপীড়িত কালো মানুষদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই যে বর্ণবিদ্বেষ ও জাতীয় নিপীড়নের বিরোধী তা প্রমাণের জন্যে কোনো বিশেষ জনমত গ্রহণের প্রয়োজন নেই। সমাজের বিকাশের জন্যে সমাজতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শ্রমিকশ্রেণী যাতে আরও গভীর উপলব্ধিতে সমৃদ্ধ হতে পারে, সেজন্যে আমাদের প্রচেষ্টা তীব্রতর করতে হবে।

বক্তারা তাঁদের আলোচনায় জনমত গঠনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির কাজকর্মের বিশেষ বিশেষ কতগুলো দিকের উল্লেখ করেন এবং নানা দেশে জনমতের বাস্তব ভূমিকার মধ্যে যেসব সাধারণ উপাদান রয়েছে তার উপর জোর দেন।

পিটম্যান বলেন, অধিকাংশ উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ যে মিল লক্ষ্য করা যায়, তা হলো তথ্য সরবরাহের আরও কেন্দ্রীকরণ এবং প্রচার

মাধ্যমের উপর একচেটিয়া পুঁজির অধিকতর নিয়ন্ত্রণ। সমস্ত ধনতান্ত্রিক ও উন্নয়নশীল দেশে কমিউনিস্টদের এর বিরুদ্ধে দাঁড়ানো উচিত এবং তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থাকে একচেটিয়া পুঁজি যাতে কব্জা করতে না পারে তার জন্যে সংগ্রাম করা প্রয়োজন।

ভাইস বলেন, বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করলেই শুধু জনমতকে পক্ষে পাওয়া যায় না। জনমত যাতে জোরালোভাবে কাজে নামে সে সম্পর্কেও তাকে উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন। এই দিক থেকে এটা কঠিন ও দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়া। কমিউনিস্টদের উচিত সমস্যাবলীর বৈজ্ঞানিক অনুশীলন করে পুংখানুপুংখভাবে কাজের পরিকল্পনা রচনা করা এবং সেগুলো সমাধান করার সম্ভাব্য উপায় আবিষ্কার করা। এই পরিকল্পনার সময় জনগণের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রস্তাবিত সিদ্ধান্তগুলোর প্রতি বিভিন্ন শ্রেণী ও জনগণের বিভিন্ন অংশের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে, তাও বিচার করে দেখা উচিত। জনমত গঠনের কার্যকর পদ্ধতিও কমিউনিস্টদের থাকতে হবে, এছাড়া তাদের আরও থাকতে হবে এমন হাতিয়ার যার সাহায্যে মতামত যাচাই করা যায়, জনমতের প্রবণতার সঙ্গে তাল রেখে চলা সম্ভব হয়।

এক্ষেত্রে মুখ্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজের সমস্ত গণতান্ত্রিক অংশ যাতে খোলাখুলিভাবে ও ব্যাপক আকারে তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারে সেই রকম পরিস্থিতি গড়ে তোলা। ইতিমধ্যেই খর্বিত বুর্জোয়া গণতন্ত্রে আর যাতে খর্বিত না হয় কমিউনিস্টরা সেই সংগ্রামের সম্মুখীন হয়েছে।

রবার্ট ফ্রান্সিস (পত্রিকায় বেলজিয়াম কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি) বলেন, এই পটভূমিতে ধনতান্ত্রিক সমাজের আপোসবিরোধী, সমালোচনামূলক চেতনার প্রয়োজনীয়তা খুব বেশি। সৃষ্টিশীল ধারায় এর আরও অগ্রগতি কমিউনিস্ট পার্টির কাজকর্মের ভিত্তির প্রসার ঘটায় এবং শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য মেহনতি মানুষের শ্রেণীচেতনার বিকাশের অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে।

কয়েকজন বক্তা উন্নত সমাজতন্ত্রে জনমত সৃষ্টির ক্ষেত্রে পার্টির কাজকর্মের কতকগুলো সাধারণ দিককে তুলে ধরেন। বোকারেভ বলেন, সমাজতান্ত্রিক সমাজ সাধারণত এটা করা হয় সেখানকার তথ্য-মাধ্যম ও শিক্ষাকে কাজে

লাগানোর মধ্যে দিয়ে। কিন্তু সমস্যাগুলোকে নির্দিষ্টভাবে মোকাবিলার ক্ষেত্রে একটি বা অনেকগুলো মাধ্যম বেছে নেওয়া যেতে পারে।

ক্লিমজ্যাক বলেন, কারখানায় ও বাসস্থান এলাকায় পার্টির দৈনন্দিন রাজনৈতিক কাজে জনগণের সমাজতান্ত্রিক চেতনা সৃষ্টির সবচেয়ে সেরা পদ্ধতি হলো পার্টি সদস্যদের ব্যক্তিগত উদ্যোগের মাধ্যমে জনগণকে বোঝানোর চেষ্টা করা এবং এই অভিন্ন প্রয়াসে তাদের যুক্ত করা। এটা শুধু ভাবাদর্শ ও শিক্ষার ক্ষেত্রে পার্টির ভাবধারা প্রসারের কাজে নিযুক্ত বিশেষ ধরণের সংস্থারই কর্তব্য নয়, সমস্ত পার্টি সদস্যেরই এটা কর্তব্য।

জনমত অনুশীলনের গবেষণা এবং সমাজতন্ত্রে এই অনুশীলনের ফলাফলকে কাজে লাগানোর বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেন বাইশ্চটারিক ও সাফিন। মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের আলোকে জনমত গবেষণার কয়েকটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেন সাফিন। এর মধ্যে প্রথমটি হলো এই সব গবেষণার জটিল প্রকৃতি। এই গবেষণার দিক থেকে শুধু জনমতের বিষয়বস্তুর বাস্তব অবস্থান, উৎপাদন ও উৎপাদিত সামগ্রীর ব্যবহারে জনগণের অংশগ্রহণ, তাদের জীবন-ধারা ইত্যাদি বিষয়গুলোও বিচার করতে হবে। দ্বিতীয় নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যটি হলো জন-চেতনার বিষয়ীগত ও বিষয়গত উপাদানের মধ্যেকার গভীর সংযোগ। জনমত সম্বন্ধে মার্কসবাদী গবেষণার তৃতীয় মূলগত বৈশিষ্ট্যটি হলো গবেষণার বিষয়গুলোর গতিশীল প্রকৃতির বিচার-বিবেচনা। কারণ, সাফিন বলেন, জনমতের একটি চিত্র পাওয়াই যথেষ্ট নয়, সমাজে যেসব বিকাশের প্রক্রিয়া চলে এবং চেতনার জগতে প্রতিবিম্বিত হয়, তার কাঠামো ও গতিধারা জানতে পারাও প্রয়োজন।

সমাজতন্ত্রে জনমত পরিমাপের যেসব নির্দিষ্ট পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়, সেগুলোর বিবরণ দেন বি সাভ্রিস্থলোভা (সায়ান্স ক্যাণ্ডিডেট, (দর্শন) ব্রাটাস্কাভিয়াতে জনমত গবেষণা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক)। জনমত গবেষণার উৎসগুলো বিশ্লেষণ করেন অর্জিয়েভ। তিনি বলেন, সমস্যাটি সমাধানের নিছক সমাজ-তান্ত্রিক পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গে (জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক ভোট, বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ) সমাজতন্ত্রে মেহনতি জনগণের মধ্যে পার্টির প্রত্যক্ষ সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক কাজকেও ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। অন্যান্য ধরন ও পদ্ধতির ভূমিকা অপেক্ষাকৃত কম।

এই প্রসঙ্গে আলোচনা-চক্রের অংশগ্রহণকারীরা ধনতান্ত্রিক দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলো যাতে সরকার ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দ্বারা জনমত গ্রহণের ফলাফল কাজে লাগাতে পারে, সে সম্ভাবনাও বিচার-বিশ্লেষণ করেন।

পিটম্যান বলেন, সি পি ইউ এস এ জনমত গবেষণা ও মূল্যায়নের নতুন নতুন রূপ অনুসন্ধান করছে। দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দ্বারা পরিচালিত জনমত গ্রহণ ও গবেষণার উদ্দেশ্য হলো মুনাফা অর্জন এবং রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদের সামাজিক ভিত্তি শক্তিশালী করা। এই জন্যেই তাদের ফলাফল বাস্তবধর্মী নয়, জাতির জনমতের চিত্রটিকে তারা বিকৃতভাবে হাজির করে।

বন্‌স্‌ডর্ফ একটা ভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা পেশ করেন। তিনি বলেন, তাঁর পার্টির কাছে জনমত গবেষণার অর্থ শুধু জনসংখ্যার মতামত গ্রহণ নয়, তার চাইতে বেশি। অন্যান্য পার্টির মতো ফিনল্যাণ্ডের কমিউনিস্ট পার্টি বাসস্থান এলাকা ও কারখানার জনগণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগের উপরই প্রধানত নির্ভর করে। আবার অন্যদিকে, জনমত গবেষণার পদ্ধতিগুলোকেও পার্টি কাজে লাগায়। এ ছাড়া আরও কাজে লাগায় অন্যান্য পার্টির সঙ্গে সহযোগিতাকে যার মধ্যে বুর্জোয়া সমাজতত্ত্ববিদরাও রয়েছেন।

পরিশেষে বাউয়ের বলেন, মার্কসীয় সমাজবিজ্ঞানের পদ্ধতি অনুযায়ী আলোচিত সমস্যাগুলোর সুগভীর তত্ত্বগত বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা এই আলোচনা-চক্রে ব্যক্ত হয়েছে। একমাত্র এই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েই গণ-চেতনাকে রূপ দেওয়া ও তাকে ক্রিয়াশীল করে তোলার করণ-কৌশল বাস্তবভাবে আয়ত্ত করা সম্ভব, এইভাবেই সমাজতন্ত্রের পক্ষে জনগণকে নিয়ে আসা এবং সক্রিয়ভাবে নতুন সমাজ গড়ে তোলার কাজে তাদের যুক্ত করার প্রয়াসে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সাফল্য অর্জিত হতে পারে।

বিকৃতির বিরুদ্ধে ইতিহাসের ঘটনাবলী

দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধ সম্পর্কে কয়েকটি বুর্জোয়া ব্যাখ্যার বিচার

সাম্রাজ্যবাদের শুরু করা সবচেয়ে রক্তাক্ত ও বিধ্বংসী যুদ্ধ হল দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধ। এই যুদ্ধের ৩৫ বছর পর এই যুদ্ধের কারণ, চরিত্র, ফলাফল ও শিক্ষা এবং আলাদা আলাদা ও সীমান্ত যুদ্ধগুলোর তাৎপর্য সম্পর্কে এখনও মানুষের আগ্রহ সমান। যুদ্ধ নিয়ে অজস্র বই বেরিয়েছে এবং এ নিয়ে আজও ফিল্ম হচ্ছে, টেলিভিসান ও বেতার কর্মসূচীতে স্থান পাচ্ছে এবং সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রে প্রবন্ধ বের হচ্ছে।

যুদ্ধের ইতিহাস বর্তমান চিন্তার লড়াইয়ে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। পুঁজিবাদী ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মার্কসবাদী গবেষক ও প্রগতিশীল ইতিহাসবিদগণ এই যুদ্ধের কারণ ও চরিত্র ও প্রধান লড়াইগুলো সম্বন্ধে নিরপেক্ষ ও পূর্ণাঙ্গ ছবি তুলে ধরেন এবং সঠিকভাবে এই যুদ্ধের ফলাফল ও শিক্ষা মূল্যায়ন করে থাকেন। তাঁরা মনে করেন যারা আজ মানব জাতির সামনে পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র ঝুলিয়ে রেখেছে এবং অপরিমেয় দুর্ভোগ ও ধ্বংসের হুমকি দিচ্ছে, তাদের কাছে দ্বিতীয় যুদ্ধ একটা কঠিন হুঁশিয়ারি। বুর্জোয়া প্রকাশনা (কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই ১০ হাজারের বেশি বই বেরিয়েছে) সম্পর্কে বলা যায়, এগুলো সাধারণত যুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করে। একচেটিয়াদের আগ্রাসী আকাঙ্ক্ষা চাপা দিতে গিয়ে তারা সাম্রাজ্যবাদকে মহিমামণ্ডিত করতে চেষ্টা করে এবং দেখাতে চেষ্টা করে এটাই যুদ্ধের প্রধান কারণ নয়। সমাজতন্ত্রের ওপর যুদ্ধের কারণটা না হলেও কিছুটা কারণ চাপাতে চেষ্টা করে এবং অতঃপর বিশ্ব-শান্তি ও নিরাপত্তার সংগ্রামে এর ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার প্রয়াস চালায়; তারা বৈপ্লবিক আন্দোলন মন্থর করতে ও তার মধ্যে অনৈক্য আনতে চেষ্টা করে; বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের রণপ্রিয় মহলগুলোর, বিশেষ করে মার্কিন দেশ ও

তার ন্যাটো মিত্রদের আগ্রাসী নীতিগুলোকে ন্যায়সঙ্গত বলে দেখাবার চেষ্টা করে।

ঘটনা বিকৃত করার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে অগ্রণী পুঁজিবাদী দেশগুলোর রাজনীতিবিদ ও ইতিহাসবিদদের এক দীর্ঘদিনের 'জোট', সামরিক ইতিহাস অধ্যয়নরত সংস্থাগুলো এবং বিশেষ রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলো। উদাহরণ দেওয়া যাক, পেন্টাগণ ১৯৩৯-৪৫ এর যুদ্ধ সম্পর্কে এক গাদা বুনিয়াদী গ্রন্থ (১০০ খণ্ডের বেশি) প্রকাশ করেছে। এই বিপুল গ্রন্থরাজির মূলটুকু হচ্ছে **দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধে মার্কিন সেনাবাহিনী**। এই সাধারণ নামে প্রায় ৮৫ খণ্ডের একটা সিরিজ। বৃটেনে, এই ধরনের বুনিয়াদী প্রকাশনা হচ্ছে ৮০ খণ্ডের **দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের সরকারি ইতিহাস**। সরকারি উদ্যোগে এটা লেখা হয়েছে। ফেডারেল জার্মানিতে ঘোষণা করা হয়েছে **ডস জার্মান রাইখ ও দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধ** (দাস দয়েশরিখ আণ্ড দার জ্বওয়েতে ওয়েল্তক্রিগ) শীর্ষক ১০ খণ্ডের গ্রন্থ বুন্দেসরের ইতিহাস বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত হবে। (এর মধ্যে ২ খণ্ড ১৯৭৯ সালেই প্রকাশিত হয়েছে)। জাপানে জাতীয় প্রতিরক্ষা সংস্থা ৯৬ খণ্ডের **যুদ্ধের সরকারি ইতিহাস ও দূর প্রাচ্য এশিয়া** (দয়েতো শেনশো কোকেন শান শি) প্রকাশিত হয়েছে। এ মাত্র কয়েক দৃষ্টান্ত।

এ সমস্ত ও অন্যান্য সরকারি প্রকাশনার কাজের ধারাটা একটু ছড়ানো ও গোছানো। কিন্তু চূড়ান্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে সমস্ত ইতিহাসবিদ দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধ সম্বন্ধে যা লিখেছেন এসব তারই চর্বিত চর্বণ মাত্র।

বিপুল সংখ্যক পাঠকদের জন্য সাম্রাজ্যবাদের মুখপাত্ররা দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধ সম্পর্কে খণ্ডের পর খণ্ড প্রকাশ করেছেন। যুদ্ধের প্রথম এই ধরনের (জর্নাল ফরম্যাট) পুর্নেল নামের একটি বৃটিশ মুদ্রন সংস্থা প্রকাশ করে। এর চোখ ধাঁধানো অঙ্গসজ্জায় এবং লেখক তালিকায় সুপরিচিত বুর্জোয়া পণ্ডিতদের নাম থাকায় বইটি যথেষ্ট পরিমাণ পাঠককে টানতে পেরেছে এবং সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ঐ বই ইতালি, স্পেনিশ এবং অন্যান্য ভাষায় অনুদিত হয়েছে এবং বহু পুঁজিবাদী দেশে ও কয়েকটি উন্নয়নশীল দেশে এই বইটি বিক্রী হচ্ছে। মার্কিন দেশে 'ব্যালেন্টাইন বুকস' এই ধরনের প্রকাশনার জনপ্রিয়তাকে মূলধন করে দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধ ও সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্ট সম্পর্কে অনেকগুলো সস্তার পেপার প্যাক বের করছে।

এই ধরনের সমর সাহিত্যের ছড়াছড়িতে মিথ্যাচার বিপুল সুযোগ পাচ্ছে এবং প্রধানত এইসব খাতে প্রবাহিত হচ্ছে। প্রথমত যুদ্ধের কারণগুলো বিকৃত করা হয়েছে; দ্বিতীয়ত আগ্রাসকদের পরাজিত করতে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকাকে ছোট করা হচ্ছে; এবং তৃতীয়ত 'সোভিয়েত সামরিক বিপদ'-এর গালগল্পকে বড় করে দেখাবার সবরকমের চেষ্টা চলছে।

দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের কারণ হিসেবে বুর্জোয়া ধারায় দার্শনিক-সমাজতাত্ত্বিক একটা যুক্তি খাড়া করা আসলে ইচ্ছাকৃতভাবেই 'যুদ্ধ'-এর ধারণাটারই একটি শ্রেণী বিমুক্ত ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করা। যেমন আমেরিকান ঐতিহাসিকটি রুপ যুদ্ধকে নিছক 'রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে একটা হিংসাশ্রয়ী সংঘাত'* মনে করেন। সর্বদাই যুদ্ধ হয়েছে এবং দুনিয়ায় যতকাল মানুষ থাকবে যুদ্ধও হতে থাকবে—ব্যাপক প্রচারিত বুর্জোয়া ধ্যান ধারণার এটাই মোদ্দা কথা। এর পেছনে নানান নৃতাত্ত্বিক আধ্যাত্মিক ও অন্যান্য 'যুক্তি' এবং হিংসার ভাববাদী তত্ত্ব এনে হাজির করা হয়।

কিন্তু লেনিনের সংজ্ঞা অনুসারে যুদ্ধ হচ্ছে 'একটি নির্দিষ্ট কালপর্বে সংশ্লিষ্ট শক্তিগুলির এবং এই দেশগুলোর অভ্যন্তরে বিভিন্ন শ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদী নীতির' ধারাবাহিকতা মাত্র (কালেক্টেড ওয়ার্কস খণ্ড ২১, পৃ ২১৯)। পুঁজিবাদকে একটা ক্ষমার আবরণ দান করার জন্য নিয়োজিত বুর্জোয়া ঐতিহাসিকদের প্রতি ঐ সংজ্ঞা আঘাত হানছে। তাই তাঁরা ঐ সংজ্ঞা প্রত্যাখ্যান করে এবং দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের দায়দায়িত্ব সাম্রাজ্যবাদের ওপর থেকে 'মানুষের স্বভাব'-এর ওপর চাপাতে চেষ্টা করেন এবং তাঁরা ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেন যে গৌণ বা নেহাৎ দুর্ঘটনাজনিত পরিস্থিতিতে রাজনীতিবিদদের (হিটলার, মুসোলিনী, তোজো, চেম্বারলিন, দালাদিয়ার) 'অত্যুৎসাহী' সিদ্ধান্তই যুদ্ধের কারণ। তারা সামাজিক ঘটনা হিসেবে যুদ্ধের শ্রেণী চরিত্র বিকৃত করে এবং সেই সঙ্গে বিকৃত করে ফ্যাসিবাদের রাজনৈতিক-সামাজিক চরিত্র যা একচেটিয়া পুঁজিপতির সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির খোলাখুলি সন্ত্রাসমূলক একনায়কত্ব।

* এনসাইক্লোপেডিয়া আমেরিকানা, খণ্ড ২৯, নিউ ইয়র্ক, ১৯৭০ পৃঃ ৩২২।

মার্কিন সমর্থনে বৃটেনে ও ফ্রান্সের ক্ষমতাসীন চক্রগুলো ফ্যাসিস্ট আগ্রাসকদের তোয়াজ করার যে নীতি নিয়েছিল এবং ১৯৩৮ সালের মিউনিখ চুক্তি যা চেকোস্লোভাকিয়াকে নাৎসিদের দয়ায় ছেড়ে দিয়েছিল তাকে যুক্তি-যুক্ত বলে দেখাবার নিরন্তর, সহিষ্ণু প্রচেষ্টা ছাড়া এটা আর কিছুই নয়। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বরে কোলোনের এক আন্তর্জাতিক আলোচনা-চক্রে পশ্চিম জার্মান ইতিহাসবিদ জি নিয়েদহার্ট জোর দিয়ে বলেন যে প্রাক-যুদ্ধের দিনগুলোতে বৃটেন "দৃঢ়ভাবে সুনিশ্চিত শান্তির উদারনৈতিক মডেল অবলম্বন করেছিল।"* ১৯২০-র ও ১৯৩০-এর দশকের গোড়ার দিকে জার্মানির নতুন করে রণসজ্জাকে সমর্থনের ধারা এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জার্মান আগ্রাসনকে চালনা করার জন্য পশ্চিমী সরকারগুলোর প্রাক যুদ্ধকালীন প্রচেষ্টা প্রভৃতি বোধ হয় 'উদারনৈতিক মডেলের' সঙ্গে অদ্ভুতভাবে 'খাপ খেয়ে যায়।' তরুণদের হ্যাণ্ডবুক হিসেবে ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে অভিযোগ করা হয় যে মিউনিখ চুক্তি 'হিটলারকে তোষণ করার জন্য এবং তারপর যুদ্ধ পরিহার করতে'** সম্পাদিত হয়েছিল।

এখন দেখানো হচ্ছে যে তোষণ করা "বিচক্ষণ ও অতীব বাস্তবসম্মত" হয়েছিল।*** তোষণ করার নীতিকে চূণকাম করতে বুর্জোয়া ঐতিহাসিকরা, যারা যুদ্ধ লাগিয়েছিল তাদের ওপর থেকে জনগণের নিন্দাবাদ অন্যপথে চালিত করে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের ঘাড়ে দোষ চাপায়। তাদের একজন মন্তব্য করেছেন, "গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্সকে লজ্জার বোঝাটা বড় বেশি বইতে হয়েছে।"**** কিন্তু বিকৃতি কখনই লজ্জাকর অতীতকে মুছে দিতে পারে না। একথা অস্বীকার করা যায় না মিউনিখ চুক্তিই দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পথ করে

---

* জি নিয়েদহার্ট, থেসেম জুম ভোরট্রাগ "দাস ইন্টারন্যাশনিয়েল সিস্টেট এণ্ডে দার ট্রেসিগার জাহার" কোলোন, ডিসেম্বর ১৯৭৯, পৃঃ ১।

** বি শাফার, ই, আগসপ্রুগার, আর ম্যাকলিমোর, ইউনাইটেড স্টেটস হিস্ট্রি, ডালাস, ১৯৭৭, পৃঃ ৫৮৭।

*** সোমাব, ১৯৩৯। ডাই গ্রোসমাচতে আণ্ড দার ইউরোপাইসে ক্রেগ, স্টুটগার্ট ১৯৭৯, পৃঃ ২২৮।

**** কে ইউব্যাঙ্ক, মিউনিখ, ওকলাহামা, ১৯৬৯, পৃঃ ৮।

দিল এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন এমন এক ঘটনার মুখোমুখি এসে পড়ল যার অর্থ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি জোটের এই দেশটির বিরুদ্ধে জড়ো হওয়া।

যে প্রধান প্রশ্নগুলোতে বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা তাদের জল্পনা-কল্পনা করে থাকে সেগুলো হচ্ছে ১৯৩৪ সালের মস্কো, সোভিয়েত, বৃটিশ, ফরাসী আলোচনা এবং বিশেষত সোভিয়েত-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি। স্ট্রসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব মডার্ন হিস্ট্রির ডিরেক্টর জাকুই ব্যারিটি স্বীকার করেছেন যে সোভিয়েত ইউনিয়ন "এই সমস্ত চূড়ান্ত আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ মনোভাব গ্রহণ করেছিল।"* কিন্তু একই নিঃশ্বাসে তিনি জোর দিয়ে বলেন সোভিয়েত ইউনিয়ন "পশ্চিমী দেশগুলোর চুক্তি সম্পাদনের আন্তরিক আগ্রহ সম্পর্কে ঘোর অবিশ্বাসী ছিল।"** সত্য হচ্ছে এই আন্তরিক আগ্রহ পশ্চিমী দেশগুলোর আদৌ ছিল না। আলোচনাকালে বৃটিশ সরকার সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর একতরফা অঙ্গীকার চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল এবং নাৎসী জার্মানির দ্বারা সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হলে তাদের কোনো সাহায্য দেওয়া হবে কিনা এ ব্যাপারে কোনো সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকার করতে চায় নি। অধিকন্তু, সোভিয়েত ইউনিয়নের অগোচরে বৃটেন নাৎসী জার্মানির সঙ্গে গোপনে আপস করল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল পোল্যাণ্ডের বিনিময়ে একটা চুক্তি করা এবং জার্মান সৈন্যদের সোভিয়েত সীমান্তে আনা। সুচতুরভাবে পুঁজিবাদী শক্তিগুলো হিটলারকে ইঙ্গিত দিল যে সোভিয়েত ইউনিয়ন নির্বান্ধব এবং জার্মানি পোল্যাণ্ডকে ও অতঃপর সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণ করতে পারে। এর জন্য পশ্চিমীদের সঙ্গে সংঘাতের আশঙ্কা নেই। ঠাণ্ডা যুদ্ধের দিনগুলোতে আমেরিকার ইতিহাসবিদ হানসন বল্ডউইন এতদূর পর্যন্ত সঙ্কোচে বলতে কসুর করেন নি যে, ১৯৪১ সালের ২২ জুন সোভিয়েত ইউনিয়ন নাৎসী জার্মানি কর্তৃক আক্রান্ত হলে পশ্চিমী শক্তিগুলো সোভিয়েতের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট করার সুযোগ হারায়।***

যৌথ ব্যবস্থা বলে ফ্যাসিবাদী আগ্রাসন প্রতিহত করা এবং দ্বিতীয় বিশ্ব

---

* লে মণ্ডে, আগস্ট, ১৯৭৬।

** ঐ

*** হানসেন বল্ডউইন, গ্রেট মিস্টেকস অব দি ওয়ার, লণ্ডন, ১৯৫০, পৃঃ ১০-১১।

যুদ্ধ পরিহার করার শেষ সম্ভাবনাটুকু অন্তর্হিত হল যখন পশ্চিমী শক্তিবর্গ মস্কো আলোচনায় অচলাবস্থা সৃষ্টি করল। সোভিয়েত ইউনিয়নকে কঠিন অবস্থায় ঠেলে দেওয়া হল। পশ্চিম ও পূর্ব দিক থেকে সোভিয়েতের দিকে আঘাত হানার সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনাগুলো প্রায় চরিতার্থ হতে চলেছিল, স্মরণ করা যেতে পারে যে সে সময় সোভিয়েত ও মঙ্গোলীয় সৈন্যবাহিনী এশিয়ার খালখিন গোল বরাবর জাপানী আগ্রাসনকারীদের সঙ্গে তীব্র লড়াইয়ে লিপ্ত ছিল।

এ পরিস্থিতিতে (সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে বিপজ্জনক যে পরিস্থিতি) সোভিয়েত সরকার জার্মানির অনাক্রমণ চুক্তির প্রস্তাব গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিল। অনিচ্ছা সত্ত্বে এ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলেও এর ফলে সোভিয়েত ইউনিয়ন সাময়িকভাবে পশ্চিম দিক থেকে বিপদ ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছিল এবং পরবর্তী ঘটনায় দেখা যায় প্রতিরক্ষা শক্তিশালী ও উন্নত করতে তারা দু বছর সময় পেয়েছিল। সি পি এস ইউ কেন্দ্রীয় কমিটি ও সোভিয়েত সরকারের প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন এই নীতিতে সোভিয়েত ইউনিয়নকে ১৯৩৯ সালে যুদ্ধে নামাবার সাম্রাজ্যবাদী প্রচেষ্টা দমে গেল এবং তাদের সোভিয়েত-বিরোধী ফ্রন্ট বানচাল হয়ে গেল। এই কারণেই জার্মানির সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ক্রমাগত কদর্য আক্রমণ চালাতে পশ্চিমী প্রতিক্রিয়াশীল মহলগুলো বদ্ধপরিকর।

ফ্যাসিস্ট জঙ্গী জোটকে পরাজিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সোভিয়েত ইউনিয়ন নয়, আমেরিকা ও বৃটেনই পালন করেছিল, এটা দেখাবার উদ্দেশে বুর্জোয়া ইতিহাসবিদরা দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের চূড়ান্ত লড়াইয়ের তত্ত্ব খাড়া করেছেন।

এই লড়াইগুলোর (ঐতিহাসিকদের মতে এর সংখ্যা ৫ থেকে ২০) মধ্যে পড়ে এল আলামেন (মিশর) এবং উত্তর আফ্রিকায় তিউনেশিয়ার যুদ্ধ, মিডওয়ে দ্বীপে নৌযুদ্ধ ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে গুয়াডালক্যানেল দখলের যুদ্ধ এবং সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টে একটি মাত্র যুদ্ধ—স্টালিনগ্রাদের লড়াই। অর্থাৎ বিপুল সংখ্যক চূড়ান্ত লড়াই লড়া হয়েছিল সেই সমস্ত রণাঙ্গনে যেগুলোতে বৃটিশ ও মার্কিন সৈন্যরা যুক্ত ছিল। একটা ভিত্তিহীন অতিরঞ্জিত

অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে প্রশান্ত মহাসাগরীয় ও উত্তর আফ্রিকার রণাঙ্গনের ওপর, অথচ গৌণ স্থান দেওয়া হয়েছে প্রধান রণক্ষেত্র সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টের ওপর। বহু বুর্জোয়া ইতিহাসবিদ পুরোপুরি এই ফ্রন্টের মস্কো, কুরস্ক এবং অন্যান্য প্রধান যুদ্ধ পুরোপুরি অবহেলা করেন।

যে কোনো পক্ষপাতহীন বিশ্লেষণকারীর কাছে যুদ্ধের মাপকাঠির এই অসঙ্গতি এবং তার চেয়েও বড় কথা এই যুদ্ধগুলোর সামরিক-রাজনৈতিক ফলাফল স্পষ্ট হয়ে যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ১৯৪২ এর অক্টোবরে ও নভেম্বরে এল-আলামেনের যুদ্ধে বৃটিশরা মোট ৮০ হাজার সৈন্য বিশিষ্ট ৪টি জার্মান ও ৮টি ইতালীয় ডিভিসানের মুখোমুখি হয়। অধিকন্তু, এই অভিযানকালে ফ্যাসিস্ট সৈন্যদের মূল অংশটা পিছু হঠে যেতে সফল হয়েছিল এবং এভাবে তারা উৎখাত হওয়া এড়াতে পেরেছিল। অন্যদিকে, স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধে জার্মান সৈন্যসংখ্যা ১০ লক্ষ ছাড়িয়ে যায়। ১৯৪২ সালের ১৯ নভেম্বর থেকে ১৯৪৩ সালের ২ ফেব্রুয়ারি স্তালিনগ্রাদে সোভিয়েত পাল্টা আক্রমণের ধাক্কায় ৩২ জার্মান ও স্যাটেলাইট ডিভিসান-এর ৩টি ব্রিগেড চূর্ণ হয়ে যায়। শত্রুপক্ষের ৮ লক্ষের বেশি সৈন্য নিহত হয়।* এই লড়াই যুদ্ধের মোড় একবারে পুরোপুরি ঘুরিয়ে দেওয়ার সূত্রপাত করল। সোভিয়েত সৈন্য-বাহিনীর পরবর্তী অভিযানে অবস্থার আরো উন্নতি ঘটল এবং এ প্রক্রিয়ার অন্যথা হওয়ার উপায়টি রইল না।

তিউনিশিয়া যুদ্ধের প্রচার সম্পর্কে বলা যায়, বৃটিশ ও আমেরিকানরা যত সংখ্যক (বর্তমান হিসেব অনুসারে ১ লক্ষ ৩০ হাজার**) জার্মান ও ইতালীয় সৈন্য বন্দী করে এনেছিল অনুরূপভাবে তা কোনমতেই স্তালিন-গ্রাদের যুদ্ধের ফলাফল বা কুরস্কের ৫০ দিনের যুদ্ধের সঙ্গে তুলনীয় নয়। কুরস্কের যুদ্ধে ৩০টি ফ্যাসিস্ট ডিভিসন চূর্ণ হয়ে যায় এবং শত্রুপক্ষের ৫ লক্ষের বেশি সৈন্য হতাহত হয়।

৪—৬ জুন, ১৯৪২—মিডওয়ে দ্বীপপুঞ্জের যুদ্ধে মার্কিন নৌবহর জঙ্গীবাদী জাপানের প্রভূত ক্ষতিসাধন করে (৪টি বিমানবাহী জাহাজ, একটা ভারী

---

* এ হিস্ট্রি অব দ্য সেকেণ্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার. ১৯৩৯-৪৫, খণ্ড ৬, মস্কো, ১৯৭৬, পৃঃ ৮১ (রুশ ভাষায়)

** এ টেলর, দ্য সেকেণ্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার, লণ্ডন, ১৯৭৫, পৃঃ ১৭২

ক্রুজার এবং ৩৩২টি বিমানের অধিকাংশ জাহাজ যুদ্ধ জলে ডুবে যায়)*। কিন্তু এতেও প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানী নৌবহরের শ্রেষ্ঠত্বের অবসান হয় নি। এ লড়াইও স্পষ্টতই দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের সার্বিক ধারা বদল করতে পারেনি। মোটামুটিভাবে গুয়াডালক্যানেলের অভিযান সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়। এখানে ১৯৪২-এর আগস্টে একটি শক্তিশালী মার্কিন নৌডিভিসান নামে। চূড়ান্ত লড়াইগুলি এবং সেই সঙ্গে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের যুদ্ধ অনেক পরে হয়। একটু বিস্ময়ের ব্যাপার যে, ১৯৪৩-এর ৭ জানুয়ারি মিডওয়ে ও গুয়াডালক্যানেলের যুদ্ধের মূল্যায়ন করতে গিয়ে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট মার্কিন কংগ্রেসে বলেন যে এই যুদ্ধগুলো মূলত আত্মরক্ষামূলক এবং "যুদ্ধের এই পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কালক্ষেপ করার নীতির অংশ।"**

মার্কসবাদী ঐতিহাসিকরা বুর্জোয়াদের এই বিকৃতিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন এবং "নিয়ামক যুদ্ধের তত্ত্ব" সমেত অন্যান্য বুর্জোয়া "তত্ত্বের" অসারতা যুক্তিসঙ্গতভাবেই দেখিয়েছেন। মার্কসবাদী ঐতিহাসিক ও যুদ্ধ বিশারদদের যুদ্ধ সম্পর্কে বহু গ্রন্থ সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রকাশিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হচ্ছে ১২ খণ্ডের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ১৯৩৯-১৯৪৫-এর ইতিহাস। এটা জোর দিয়েই বলা দরকার যে তাঁদের গ্রন্থগুলোতে সোভিয়েত ইতিহাসবিদরা আমেরিকা, বৃটেন, চীন, ফ্রান্স, কানাডা এবং হিটলারবিরোধী কোয়ালিশনের অন্যান্য দেশের অবদান এবং কলোনিগুলো ও পরনির্ভর দেশগুলোর জাতিসমূহের প্রতিরোধ পরিস্থিতি অনুসারে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে অবস্থার গুণাগুণের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করেছেন। অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশেও যুদ্ধ সম্পর্কে মার্কসবাদী গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়েছে। এ দেশগুলোর ইতিহাসবিদরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একটি সংক্ষিপ্ত যুক্ত ইতিহাস প্রণয়ন করছেন। আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স, ইতালি এবং আরো কয়েকটি পুঁজিবাদী দেশের মার্কসবাদী ঐতিহাসিকরাও যুদ্ধের একটি

---

* এ হিস্ট্রি অব দ্য সেকেণ্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার, ১৯৩৯-৪৫, খণ্ড ৫, মস্কো, ১৯৭৫, পৃঃ ৩৯৫ (রুশ ভাষায়)

** দ্য পাবলিক পেপার্স অ্যাণ্ড অ্যাড্রেসেস অব ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট, এস, রোসেনম্যান সংকলিত, খণ্ড ১২, নিউ ইয়র্ক, ১৯৬৯, পৃঃ ২২

পক্ষপাতহীন চিত্র তুলে ধরার ব্যাপারে একটা বড় ভূমিকা পালন করেছেন। ফ্যাসিস্টদের পরাজিত করার ব্যাপারে সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টের গুরুত্ব যারা উড়িয়ে দেয়, কমিউনিস্টরা তাদের গ্রন্থে ও পত্র-পত্রিকায় মুখের মতো জবাব দেয়। দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়, এ লণ্ডমেটের যখন আমরা যুদ্ধ জিতলাম, ইউরোপের বিজয়ের ইতিহাস গ্রন্থে ফ্যাসিস্ট-জঙ্গী ব্লকের পরাজয় সূচিত করতে সোভিয়েত ইউনিয়নকে ছোট করার ব্যর্থ প্রয়াস চালানো হয়েছে। বৃটেনের বামপন্থীদের কাগজ 'মর্ণিং স্টারে' লেখা হয়েছে, "পশ্চিম সীমান্তে বৃটেন, কমনওয়েল্‌থ ও মার্কিন সৈন্যবাহিনীর চমৎকার, প্রয়াস সত্ত্বেও, একথা কেউ অস্বীকার করবেন না যে সবচেয়ে কঠিন ও তীব্র লড়াই হয়েছিল পূর্ব সীমান্তে। এই সীমান্তে ১৯৪১ থেকে রাশিয়ানরা ভেরম্যাকট্-এর (হিটলারবাহিনী) বিপুল অংশের সঙ্গে লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়েছিল।"*

বুর্জোয়া ইতিহাসবিদদের ছলচাতুরির আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন আর কোনো পথ নেই। তাঁরা যুদ্ধের ধারণা ও তত্ত্বগুলো 'নতুন করে খাড়া করছেন' এবং তাঁদের যুক্তিগুলো ধরাবার জন্য বেশ খানিকটা নমনীয়তার আশ্রয় নিয়েছেন। একটা দৃষ্টান্ত হচ্ছে, 'নিয়ামক যুদ্ধের তত্ত্ব' সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পরিবর্তিত হয়েছে। বুর্জোয়া ইতিহাসবিদদের এখন স্বীকার করতে হয়েছে যে স্তালিনগ্রাদের লড়াই ছাড়াও মস্কো ও কুরস্কের যুদ্ধগুলোও চূড়ান্ত তাৎপর্যমণ্ডিত। এঁদের একজন হ্যানসন বল্ডউইন, যাঁর কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি, তিনি তাঁর নতুন বইটিতে স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধই কেবল তাৎপর্যমণ্ডিত ছিল বলে আগে যে কথা বলেছিলেন তা না উল্লেখ করেই লিখেছেন "দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের ইতিহাসে মস্কোর যুদ্ধ মোড় ফিরিয়েছে—স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ"**

তারচেয়ে বড় কথা, সব পশ্চিমী বুর্জোয়া ইতিহাসবিদ 'নিয়ামক যুদ্ধের তত্ত্ব'কে কোনমতেই মানেন না। যাঁরাই নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ হাজির করতে চান তাঁরাই সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টের অভিযানের গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য লক্ষ্য

---

* মর্ণিং স্টার, ৯ জুন, ১৯৭৭

** হ্যানসন বল্ডউইন, দ্য ক্রুশিয়াল ইয়ার্স, নিউ ইয়র্ক, ১৯৭৬, পৃঃ ২০।

করেন। ফরাসী ইতিহাসবিদ হেনরি মাইকেল লিখেছেন, সোভিয়েত ইতিহাসবিদরা যথার্থই বলেছেন যে স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধ এমন 'এক গুরুত্বপূর্ণ বিজয় যা বিশ্ব-যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিল।'* অন্যদিকে বৃটিশ ঐতিহাসিক এ টেলর লিখেছেন, "জার্মান সেনাবাহিনীর লড়াইয়ের মতন শক্তি পূর্ব সীমান্তে সর্বদাই ছিল।"**

বিরলদৃষ্ট ঘটনা হলেও কয়েকজন মার্কিন ঐতিহাসিকও নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ করেছেন। রাশিয়ান ক্রণ্ট নামক বইতে লেখক বলেছেন "বস্তুত জার্মানিরা দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধে হেরে গিয়েছিল সোভিয়েত ভূমিতেই, নরমাণ্ডিতে নয়।"*** নিঃসন্দেহে এই ধরনের মূল্যায়ন সঠিক এবং আগ্রাসকদের বিরুদ্ধে জয়লাভে বিভিন্ন দেশের অবদান নির্ভুলভাবে তুলে ধরে।

শেষত, একটা ব্যাপার অবহেলা করা যায় না যে বেশ কিছুকাল ধরে জঙ্গীবাদী জাপানের বিরুদ্ধে জয়ের ক্ষেত্রে সোভিয়েত ভূমিকা নিয়ে মার্কিন বুর্জোয়া সাহিত্যে কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট বিতর্ক চলছে। এ নেহাৎই কৃত্রিমভাবে উস্কে দেওয়া হয়েছে। এই বিতর্ক শুরু করেন স্বয়ং মার্কিন প্রেসিডেন্ট হেনরি এস ট্রুম্যান। তিনি একটি চিঠি আমেরিকার ঐতিহাসিকদের লেখেন, "জাপানকে করায়ত্ত করতে রুশরা কোনো সামরিক ভূমিকা পালন করেন নি।"**** ঠিক এটির জন্যই প্রতিক্রিয়াশীলরা অপেক্ষা করেছিল।

কিন্তু ইতিহাস ভিন্ন কথা বলে। ১৯৪৫ সালের মে মাসে বার্লিন দখলের পরই নাৎসী জার্মানির পরাজয়ের পালা চূড়ান্ত হল। এই ঘটনাই জঙ্গীবাদী জাপানের পরাজয় নির্ধারণ করে দিল। অবশ্য মঙ্গোলিয়ার মন্ত্রিপরিষদের চেয়ারম্যান জামবিন বাটমুনখ দেখিয়েছেন, এর পরেও যুদ্ধ শেষ করতে চূড়ান্ত প্রয়াস চালাতে হয়েছিল। তিনি লিখেছেন, "সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং বীর

---

* হেনরি মাইকেল, লা সেকেণ্ড গুয়েরে মণ্ডিয়াল, খণ্ড ১, প্যারিস ১৯৭৭, পৃঃ ৪৬৭।

** এ টেলর, দি সেকেণ্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার, লণ্ডন, ১৯৭৫ পৃঃ ১৮৮।

*** ড রাশিয়ান ক্রণ্ট, জার্মানিস ওয়ার ইন দি ইস্ট, ১৯৪১-৪৫, লণ্ডন-মেলবোর্ন, ১৯৭৮, পৃঃ ১৬।

**** আর্মি অ্যাণ্ড এয়ারফোর্স ইন ওয়ার্ল্ড ওয়ার-২, খণ্ড ৫, শিকাগো, ১৯৫৫, পৃঃ ৭১২।

সশস্ত্র বাহিনী নাৎসীবাদ ও জাপানী সমরবাদের বিরুদ্ধে বিজয়ে নিয়ামক ভূমিকা পালন করেছিল।"* (মঙ্গোলিয়া সৈন্যরা জাপানী আক্রমণকারী-দের চূর্ণ করতে অংশ নিয়েছিল।)

৬ ও ৯ আগস্ট, ১৯৪৫। আমেরিকানরা জাপানের দুটি শহর হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে বোমা ফেলল। শত সহস্র নাগরিক নিহত বা পঙ্গু হয়ে গেল। কিন্তু এতেও জাপান যুদ্ধে ক্ষান্ত হল না। তখনও তাদের ৫০ লক্ষ যোদ্ধাবিশিষ্ট স্থলবাহিনী, একটা বিরাট বিমানবন্দর এবং প্রভূত পরিমাণ অস্ত্রের মজুত ছিল।

তার মিত্রদের সঙ্গে চুক্তি পূর্ণ করতে এবং দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ তাড়াতাড়ি অবসান করার আগ্রহে সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৪৫ সালের ৯ আগস্ট জাপানের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হল। একই দিন সুপ্রিম ওয়ার কাউন্সিলের বৈঠকে জাপানের প্রধানমন্ত্রী সুজুকি ঘোষণা করলেন, "আজ সকালে সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধে নামায় আমরা চূড়ান্ত অসহায় অবস্থায় পড়েছি এবং এখন যুদ্ধ চালানো অসম্ভব হয়ে পড়েছে।"** সোভিয়েত ও মঙ্গোলিয়ার সৈন্যবাহিনী জাপানের প্রধান স্থলবাহিনীকে, লক্ষাধিক সৈন্যবিশিষ্ট কুয়াংটাঙ সৈন্যদলকে চূর্ণ করল এবং ২ সেপ্টেম্বর জাপান আত্মসমর্পণ করল। বিভিন্ন মার্কিন সদর দপ্তরের অনুমান হচ্ছে, সোভিয়েতে মার্কিন দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত জর্জ কেনান তো পরিষ্কার বলেছেন সোভিয়েত ইউনিয়ন না থাকলে যুদ্ধ ১৯৪৬ সালের শেষ দিক অবধি গড়াত।*** সোভিয়েত ইউনিয়নের আরেকজন প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূত চার্লস বোহলেন স্বীকার করেছেন জাপানের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত লড়াইয়ে সোভিয়েত সাহায্য আমেরিকার বিপুল পরিমাণ ক্ষতি বাঁচিয়েছে।****

দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতিকে প্রতিক্রিয়াশীলরা 'সোভিয়েত

---

* ওয়ার্ল্ড মার্ক্সিস্ট রিভিউ, আগস্ট ১৯৭৫।

** ইনু কিয়োশি ও অন্যান্যরা, এ হিস্ট্রি অব মডার্ন জাপান, মস্কো, ১৯৫৫ পৃঃ ২৬৩-৬৪ (রুশীয় অনুবাদ)।

*** জর্জ কেনান, রাশিয়া অ্যাণ্ড দি ওয়েস্ট আণ্ডার লেনিন অ্যাণ্ড স্তালিন, লণ্ডন ১৯৬১, পৃঃ ৩৭৮।

**** চার্লস বোহলেন, উইটনেস টু হিস্ট্রি, ১৯২৯-১৯৬৯, নিউইয়র্ক, ১৯৭৩, পৃঃ ২০০।

সামরিক হুমকি'র গালগল্প হিসেবে ব্যবহার করছে। এই দিকে লক্ষ্য রেখে অভিযোগ করা হচ্ছে যুদ্ধের আগে ও যুদ্ধের সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের 'সম্প্রসারণকামী উচ্চাশা' ছিল, এই দেশের শান্তির পররাষ্ট্র নীতিকে ভুল-ভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে এবং ইউরোপে সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনীর মুক্তিকামী উদ্দেশ্যকে তাচ্ছিল্য করা হচ্ছে।

এইসব মিথ্যের পশ্চিম জার্মান প্রবক্তার (ইউ. ওয়ালেণ্ডে, ডাবলু গ্লাসব্রুক, ই হেমডাখ ও অন্যান্যরা) প্রাকযুদ্ধকালীন বছরগুলোতে সোভিয়েত ইউনিয়ন পশ্চিম সীমান্তকে জোরদার করার জন্য যে ব্যবস্থা নিয়েছিল সেগুলোকে মধ্য-ইউরোপ আক্রমণের প্রস্তুতি বলে চালিয়েছিল। আমেরিকান জেনারেল এম. ম্যাকলস্কি নিজেকে সামরিক ঐতিহাসিক বলে দাবি করে থাকেন। তিনি জোরের সঙ্গে বলেন "পশ্চিমে বৃটেনের সঙ্গে যুদ্ধরত জার্মানরা রুশীয় সম্প্রসারণ মেনে নিতে পারত না।"* বৃটিশ ঐতিহাসিক ডি আরভিং রুশীয়রা যে জার্মানদের ভয় দেখাচ্ছিল এই বক্তব্য প্রমাণের জন্য কাল্পনিক গোয়েন্দা রিপোর্ট ব্যবহার করেছেন।

হিটলার সোভিয়েতের বিরুদ্ধে 'প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ' করেছিল—এই মিথ্যের উৎস কী। ১৯৪১ সালের জুন মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নে চুপিসাড়ে আক্রমণকে যুক্তিসিদ্ধ করার জন্য নাৎসীরাই এই মিথ্যে চাউর করেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আগ্রাসনের কাজকে যুক্তিযুক্ত প্রমাণের জন্য জাপানী জঙ্গীবাদীরা একই মিথ্যার আশ্রয় নেয় এবং তারা জাপানী বুর্জোয়া ঐতিহাসিকদের (যেমন, টি হাটোরি) সঙ্গে কারবার পাতায়।

দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধকালে সোভিয়েত ইউনিয়নের মুক্তিকামী উদ্দেশ্যকে অনুরূপভাবে প্রতিক্রিয়াশীল ঐতিহাসিক ও প্রচারকরা 'সোভিয়েত সামরিক বিপদ'-এর গালগল্প আঁকড়ে থাকার জন্য ইচ্ছে করেই বিকৃত করে। তারা জোর দিয়ে বলে সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, বুলগেরিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, নরওয়ে এবং অন্যান্য দেশে প্রবেশ করেছিল তাদের জনগণের ইচ্ছের বিরুদ্ধে। তারা সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীকে এমনই

* এম. ম্যাকলস্কি, **প্লানিং ফর ভিক্টরি—ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু**, নিউ ইয়র্ক, ১৯৭০, পৃঃ ১।

* ডি আরভিং, **হিটলার ওয়ার**, লণ্ডন, ১৯৭৭, পৃঃ ১৬২, ১৬৭, ১৭৭।

এক শক্তিরূপে চিত্রিত করে যারা মুক্ত জাতিগুলোর মাথায় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়।'

এ সমস্ত দেশের জনগণকে অপমান করা ছাড়াও এই ধরনের বানানো কাহিনী সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তাদের সশস্ত্র বাহিনীকে, পরাষ্ট্রনীতিকে কদর্যভাবে কুৎসা করার প্রয়াস ভিন্ন কিছুই নয়। ফ্যাসিস্ট জোয়াল থেকে বিদেশী দেশগুলোকে মুক্ত করতে গিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন কঠোরভাবে কার্যকরী চুক্তিগুলি মান্য করেছিল। দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক, ১৯৪৪ সালের বসন্তে রুমানিয়ার নেতাদের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী সোভিয়েত সেনা-বাহিনী পোল্যাণ্ডে প্রবেশ করে। ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বরে চেকোস্লোভাকিয়ার সঙ্গে এবং ১৯৪৪ সালের মে মাসে নরওয়ের সঙ্গে অনুরূপ চুক্তি হয়। যুগোস্লাভিয়ার গণ-মুক্তিবাহিনীর সম্মতি অনুসারে শত্রু বিতাড়নের জন্য সোভিয়েত সেনাদল ঐ দেশের সীমানায় ঢোকে। যুগোস্লাভিয়ার গণমুক্তি সংগ্রামের প্রধান যোশেফ ব্রোজ টিটো পি-এল-এ ও সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীর যুক্ত উদ্যোগে বেলগ্রেদ মুক্তি উপলক্ষে ১৯৪৪ সালের ২৭ অক্টোবর এক ভাষণে বলেন. "এই পবিত্র রক্তস্নাত ভূমি থেকে অভিশপ্ত শত্রুদলকে দূর করে দিতে তোমাদের লাল ফৌজের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করা উচিত।"*

ইউরোপীয় ও এশীয় দেশগুলো মুক্ত করার জন্য সশস্ত্রবাহিনী পাঠিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন কখনই তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে নি। বরং জাতীয় ঐতিহ্য ও রীতির প্রতি মর্যাদা দিয়েছিল। সেইসব দিনে একাধিক দেশে (অস্ট্রিয়া, ডেনমার্ক, ইরাণ, নরওয়ে) যেখানে সোভিয়েত সৈন্য গিয়েছিল, সেখানে বুর্জোয়া ব্যবস্থাই প্রধান ছিল। এই সব দেশে যে অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায় বিপ্লবী শক্তিগুলির সাফল্য সুনিশ্চিত হতে পারত, সে সময় স্পষ্টতই তার অস্তিত্ব ছিল না। সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী আলবানিয়া বা ভিয়েতনামে যায় নি। তবু এ দুটি দেশে বিপ্লবী পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল।

আন্তর্জাতিকতাবাদী দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী বিশ্বব্যাপী প্রশংসা অর্জন করেছিল। তারা ইউরোপ ও এশিয়ার মোট ২০ কোটি জনসংখ্যাবিশিষ্ট ১২টি দেশের পুরো বা আংশিক সীমানা মুক্ত করে

* যোশেফ ব্রোজ টিটো, সিলেক্টেড আর্টিকেলস অ্যাণ্ড স্পিচেস, মস্কো ১৯৭৩, পৃঃ ১৪৪ (রুশীয় অনুবাদ)।

ছিল। এসব দেশ মুক্ত করতে গিয়ে তাদের ক্ষতির পরিমাণ ছিল ৩০ লক্ষ, এর মধ্যে মৃত্যু সংখ্যাই ছিল ১০ লক্ষ। চেকোশ্লোভাকিয়া কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক গুস্তাভ হুসাক বলেন, "যারা দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের মধ্য দিয়ে গিয়েছে এবং ফ্যাসিবিরোধী লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেছে, তারা কখনই জাতিগুলোর মুক্তিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের তুলনারহিত ভূমিকা, তাদের আত্মত্যাগ এবং তাদের জনগণ ও সৈন্যবাহিনীর বীরত্ব বিস্মৃত হবে না। তারা কখনই বিস্মৃত হবে না যে সোভিয়েত ইউনিয়নের সংগ্রাম ও ত্যাগ বহু দেশকে তাদের জাতীয় মুক্তি এবং দেশীয় স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারে এবং সেইসঙ্গে সমাজতন্ত্রের পথে যাওয়ার জন্য-শ্রমিক শ্রেণীর বিজয়ে সমর্থ করেছিল।"*

এই হচ্ছে ইতিহাসের ঘটনাবলী। ঠিকই, বুর্জোয়াদের লেখাতেও স্বীকার করা হয়েছে যুদ্ধ বিশ্ব প্রেক্ষাপটের নাটকীয় পরিবর্তন সূচিত করেছে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা যুদ্ধের সামাজিক-রাজনৈতিক ফলাফল কিভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল ঐতিহাসিকরা প্রকাশ্যেই আক্ষেপ করেন যে সাম্রাজ্যবাদী মহলগুলোর প্রত্যাশিত ফলাফল দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধ আনতে পারে নি। সোভিয়েত ইউনিয়ন কেবল পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হয় নি, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে শান্তি, গণতন্ত্র ও সামাজিক প্রগতির জন্য জাতিসমূহের লড়াইয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন পতাকাবাহী হয়ে দাঁড়াল।

বুর্জোয়া ইতিহাসবিদরা প্রায়শই প্রশ্ন করে থাকেন: সাম্রাজ্যবাদী কোয়ালিশানগুলোর সংঘাতের মধ্যে যুদ্ধ কিভাবে শুরু হতে পারল? সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর যুক্তফ্রন্ট গঠনের পরিকল্পনা কেন বাস্তবায়িত হল না? সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বর্তমান সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে 'নয়া কোয়ালিশন'-এর যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করতে তারা এখন ব্যস্ত। যেমন, আমেরিকার লেঃ কর্ণেল এল. পামার এক প্রবন্ধে লিখেছেন রাশিয়া তথা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সব আক্রমণ ব্যর্থ হয়েছিল কারণ সেগুলো পশ্চিমীদের পক্ষ থেকে করা হয়েছিল। তাই তিনি বর্তমান পিকিং নেতৃবৃন্দের সোভিয়েত-বিরোধী নীতিগুলোর সঙ্গে যোগসূত্র রেখে আশা রাখেন প্রাচ্যের দিক থেকে একটা আক্রমণ হবে। তিনি বলেছেন, 'রাশিয়ার সঙ্গে সংঘাতে

* কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলোর আন্তর্জাতিক সম্মেলন, মস্কো ১৯৬৯, প্রাগ ১৯৬৯, পৃঃ ৪০৪-৪০৫

লাল চীন যে আমাদের সবশেষে কট্টর মিত্র হবে' একথাটা হিসেবের বাইরে রাখলে চলবে না।

প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া লেখকরা যুদ্ধ ও তার শিক্ষাকে যতোবেই মিথ্যে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করুন না কেন, প্রধান শিক্ষা এটাই যে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ যুদ্ধগুলোর কারণ। বিশ্বে প্রভুত্ব করার জন্য এবং সমাজতন্ত্র, শান্তি ও প্রগতির স্তম্ভ সোভিয়েত ইউনিয়নকে ধ্বংস করতে তারা একদা মানবজাতিকে বিপর্যয়ের অন্ধকারে নিমজ্জিত করেছিল। সাম্রাজ্যবাদ সেই ফ্যাসিস্ট-জঙ্গী-শাসনকে জীবনদান করেছে। ফলে আরেকটি যুদ্ধের বিপদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হলে সর্বাগ্রে সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের আগ্রাসী আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধেই লড়তে হবে।

দ্বিতীয় শিক্ষা : আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের সোভিয়েতবিরোধী নীতি-সমূহ মূলত দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পথ করে দেয় এবং সমাজজীবন থেকে যুদ্ধকে পরিহার করায় বাধা দিয়ে চলেছে তারা। সোভিয়েত-বিরোধিতা, কমিউনিস্ট-বিরোধিতার আদর্শ এবং সেই আদর্শজাত 'সোভিয়েত সামরিক হুমকী'র গালগল্প, অস্ত্র প্রতিযোগিতা ও সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী পরিকল্পনা এবং সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলো, আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণী ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে চালিত চীনা একাধিপত্যবাদের ছদ্মাবরণ হিসেবে ক্রিয়াশীল। তাই যুদ্ধের বিরুদ্ধে লড়াই সোভিয়েত-বিরোধিতার বিরুদ্ধে লড়াই এবং ইতিহাস ব্যাখ্যায় সাম্রাজ্যবাদের কমিউনিস্টবিরোধী আদর্শগত অন্তর্ঘাতের বিরুদ্ধেও লড়াই।

তৃতীয় শিক্ষা : শান্তি ও সমাজতন্ত্রের শক্তিগুলো অজেয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতন্ত্র ফ্যাসিস্ট আগ্রাসনের দহন-ক্ষত অঙ্গে ধারণ করেছে এবং তারা মানবজাতিকে ফ্যাসিস্ট দাসত্বে বন্দী হওয়ার বিপদ থেকে বাঁচিয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক পরিবারের অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ ও সমস্ত বিপ্লবী শক্তির সম্মিলিত শক্তি যে কোনো আগ্রাসকের কাছে অনতিক্রম্য বাধা। সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী কার্যকলাপ এবং বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিবিপ্লব রপ্তানির বিরুদ্ধে সফল সংগ্রামে এটা

---

* আর্থ.র, নং ৬, ১৯৬৯, পৃঃ ৫৪

ভালভাবেই প্রদর্শিত হয়েছে। তাই বর্তমান সমাজতন্ত্র ও অন্যান্য বিপ্লবী শক্তির বলবৃদ্ধি তাদের সংগ্রামী ঐক্য এবং সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী পরিকল্পনার বিরুদ্ধে বিশ্ব-ব্যাপী প্রগতিশীল শক্তিগুলোর মুক্ত, সংকল্পবদ্ধ সংগ্রামই হচ্ছে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার পক্ষে লৌহবর্ম গ্যারান্টি।

ওলেগ র. মেশেরস্কি
ডক্টর অব হিস্টরিক্যাল সায়েন্সেস
(ইউ এস এস আর)

শ্রেণী সংগ্রাম ফ্রন্টে

১৯৭৯ থেকে ১৯৮০ সালের প্রথমে উন্নত পুঁজিবাদী দেশের ধর্মঘট আন্দোলন

মে দিবসে শ্রমিক শ্রেণী ও অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষ তাদের অধিকার, সামাজিক অগ্রগতি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্য নিজেদের সংগ্রামের ফলাফল পর্যালোচনা করে। পুঁজির বিরুদ্ধে শ্রেণী সংগ্রামে তারা তাদের বহু পরীক্ষিত অস্ত্র ধর্মঘটকে ব্যবহার করে।

নিম্নে ঙ সারণী থেকে গত দুই দশকের উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোর ধর্মঘট আন্দোলনের চিত্র পাওয়া যাবে :—

	ধর্মঘটীদের সংখ্যা (মিলিয়ন)*
১৯৬০	৪৪
১৯৬৫	১১
১৯৭০	৪৫
১৯৭৫	৫০
১৯৭৯	৫০ এর ঊর্ধ্বে

* সংগ্রামের জাতীয় দিবসগুলোতে অংশগ্রহণকারীদের যোগফল।

আমরা দেখতে পাই যে, ধর্মঘটীদের সংখ্যা যথেষ্ট বেড়েছে। শ্রমিক শ্রেণী ও শ্রমজীবী মানুষের সংগঠন একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম বাড়িয়ে তুলেছে। ১৯৭৪-৭৫ সালের চক্রাকার সংকটের সময় পুঁজিবাদী দেশগুলোতে ধর্মঘট আন্দোলন অতীতের মতো দুর্বল না হয়ে শক্তিশালী

হয়েছে। ধর্মঘট সংগ্রামের আকার নিম্নোক্ত সারণী থেকে দেখা যাবে:—

(১০০০ শ্রমদিবস)

	১৯৭৮	১৯৭৯
অস্ট্রেলিয়া	২,১৩১	৩,৫৩৯*
বেলজিয়াম	১,০০২	৫৪১*
কানাডা	৭,৪৯০	৬,৫০০**
গ্রেট ব্রিটেন	৯,৪০৪	২৯,০০০
ইটালী	৭১,২৩৯	১৫৩,৫৩৩**
ইউ এস এ	৩৯,০০০	৩৩,১৪২***

* ৯ মাস, ** ১০ মাস, *** ১১ মাস।

ফ্রান্স ও জাপান সহ কিছু দেশের তথ্য এখানে নেই, সেসব জায়গায়ও ধর্মঘট আন্দোলন দারুণভাবে হয়েছে (১৯৭৯ সালের অক্টোবরেই ফ্রান্সে ১২৫০ ধর্মঘট ও অন্যান্য আন্দোলন হয়েছে, ১৯৭৯ সালের বসন্তকালে জাপানে ১ কোটি ২০ লক্ষ শ্রমিক ও কর্মচারী ধর্মঘট করেছে)। এই ধরনের অসম্পূর্ণ তথ্য থেকেও শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের বিশালত্ব দেখা যায়।

গত দশকে, বিশেষ ক'রে ১৯৭৯ সালে ও ১৯৮০ সালের প্রথম দিকে এমন সব ধর্মঘট হয়েছে যার মধ্যে মেহনতি মানুষের কিছু সংগ্রামশীল বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গিয়েছে। এটা হোলো তাদের সংগ্রামের ঐক্য। এটা জাতীয় ধর্মঘট-গুলোতে প্রকাশ পেয়েছে, যখন শত সহস্র এমনকি লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষ আন্দোলনে সামিল হয়েছে। ১৯৭৯ সালের ৭ই ডিসেম্বর ২৪ ঘন্টার সাধারণ ধর্মঘটে বেলজিয়াম স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, গত দুই দশকে যা বৃহত্তম। প্রায় একই সাথে গ্রীসের শ্রমজীবী মানুষ জাতীয় ধর্মঘট করে, যা ১৯৭৯ সালে ও এ বছরের প্রথমদিকে বার বার হয়। আগের মতোই ইটালীর শ্রমজীবী মানুষ ঐক্য ও সংগঠন ঐক্যের উচ্চ পর্যায় দেখিয়েছে। ১৯৭৯ সালের জুন মাসে যৌথ দর কষাকষির জন্য জাতীয় ধর্মঘটে ১ কোটি ৪০ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষ, ১৯৮০ সালের জানুয়ারীর মাঝামাঝি, দেশের গণতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক রূপান্তরের জন্য জাতীয় ধর্মঘটে ১ কোটি ৪০ লক্ষ শ্রমিক ও কর্মচারীর যোগদান

চমৎকারভাবে সফল হয়েছে। আয়ার্ল্যাণ্ড, স্পেন, নিউজিল্যাণ্ড ও অন্যান্য দেশেও সাধারণ ধর্মঘট হয়েছে।

ব্যাপক সংখ্যায় শ্রমজীবী মানুষের অংশগ্রহণ হচ্ছে প্রলেটারিয়েতের ধর্মঘট সংগ্রামের বৈশিষ্ট্য। কতগুলো উদাহরণ দেওয়া যাক্। ১৯৭৯ সালের গ্রীষ্মে ১০০০০০ শ্রমিক ও কর্মচারী কানাডার কুইবেক প্রদেশে ধর্মঘট করে এবং সেই সময়ে ব্রিটেন, ইটালী, স্পেন, অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকায় হাজার হাজার শ্রমজীবী মানুষ ধর্মঘটে যোগ দেয়। সেপ্টেম্বর মাসে ইটালীতে ৫০ লক্ষ সরকারি কর্মচারী ধর্মঘট করে এবং ২০০০০০ ফরাসী রেলশ্রমিকও ধর্মঘট করে, অক্টোবরে হাজার হাজার রেনো মোটর কারখানার কর্মচারী ও ফরাসী কেমিক্যাল শিল্পে ২০০০০০ শ্রমিক ধর্মঘট করে। নভেম্বরে, অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যাণ্ডে ২০০০০০ শ্রমিক ধর্মঘট করে এবং ১৯৮০ সালের প্রথমদিকে আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, স্পেন, তুরস্ক, ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশে শক্তিশালী ধর্মঘট হয়।

দীর্ঘকালীন ধর্মঘট প্রায়শঃই হতে থাকে। প্রায়ই ধর্মঘটীদের দাবী আদায়ের জন্য কঠিন সংগ্রামে নামতে হয়। ১৯৭৯ সালের অক্টোবরে, বহুজাতিক স্টাণ্ডার্ড ইলেকট্রিক কোম্পানীর পর্তুগালের সহযোগী কারখানায় ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে ১১ মাসব্যাপী দীর্ঘ সংগ্রাম সফল হয়। ব্রিটিশ টাইম্স পত্রিকার মালিক ও ছাপাখানার কর্মীদের মধ্যে সংঘাত সাড়ে ১১ মাস ধরে চলে এবং ১৯৭৯ সালের শরৎকালে তা সফল হয়। ঐ বছর ডিসেম্বরে মার্কিন ক্যাটারপিলার ট্র্যাক্টর কোম্পানীর ২৩০০০ শ্রমিক ২ মাস ধরে ধর্মঘট করে সফল হয়। অন্যান্য দেশেও এরকম বহু দৃষ্টান্ত আছে।

এই ধরনের শ্রেণী সংগ্রামে, ১৯৮০ সালে গ্রেট ব্রিটেনের ১০০০০০ ইস্পাত কর্মচারীর জাতীয় ধর্মঘট উল্লেখযোগ্য। ১লা জানুয়ারি রাতে ডজন ডজন ইস্পাত কারখানা বন্ধ করে খেওয়া হয়। শ্রমিকরা কারখানার গেটে পিকেট করল, ১৯২৬ সালের পর থেকে ব্রিটেনের ভারী শিল্পে এই ধরনের ধর্মঘট প্রথম, সরকার পরিচালিত ব্রিটিশ ইস্পাত কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা প্রথমে উচ্চতর মজুরির জন্য ধর্মঘটীদের দাবী মানে নি। বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে ব্রিটিশ ইস্পাত কর্মচারীরা ধর্মঘট করে, মার্গারেট থ্যাচারের নেতৃত্বাধীন রক্ষণশীল সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম চলে।

বিভিন্ন ধরনের সংগ্রাম শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনকে আরও বেশী কার্যকরী করে তোলে। ধর্মঘটীদের পাশাপাশি শ্রমিকশ্রেণীও মিটিং মিছিল করে। এই বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে, ফ্রান্সের সবচেয়ে বড় ট্রেড ইউনিয়ন জেনারেল কনফেডারেশন অব লেবার-এর (সিজিটি) ডাকে উচ্চ মজুরি, গণ-ছাঁটাই ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার রক্ষার জন্য এক পক্ষকালের আন্দোলন চলে।

এই সংগ্রামের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একজন সিজিটি নেতা রেনে লমে বলেন, "আমরা সমস্ত সংস্থায় সংগ্রামের প্রসার চাই, প্রতিটি নীচের তলার সংগঠনে বিভিন্ন সংগ্রাম চাই। ব্যাপক ঐক্যের ওপর ভরসা করে আমরা সংগ্রাম চালাতে চাই।" ১৯৭৯ সালের মে মাসে মার্কিন রবার শ্রমিক ইউনিয়ন, যার ৪০০০০ সদস্য, ইউনিরয়্যাল একচেটিয়ার বিরুদ্ধে সংগঠিত সংগ্রাম করে। শেষ পর্যন্ত কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রমজীবী মানুষকে অনশন ধর্মঘট করতে হয়। ধর্মঘট করার জন্য ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে ১৯৭৯ সালের বসন্তকালে স্পেনীয় প্রদেশ ভ্যালেন্সিয়াতে ফোর্ড কোম্পানীর শ্রমিকরা তাই করে। ১৯৭৯ সালের শরৎকালে ফ্রান্সে বার্লিয়ে নমাটর কারখানায় ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে দু'জন ট্রেড ইউনিয়ন নেতা একই কাজ করে।

শ্রমজীবী জনগণের সামাজিক-আর্থনীতিক দাবী, উচ্চ মজুরি, ভালো কাজের অবস্থা, কম শ্রমসময় ইত্যাদি দাবীর জন্যই শুধু ধর্মঘট করা হচ্ছে না। ধর্মঘট একটি সক্রিয় ও গণ-রাজনৈতিক আন্দোলনেরই** রূপ নিচ্ছে। ১৯৭৯ সালের গ্রীষ্মকালে স্পেনের সবচেয়ে বড় ট্রেড ইউনিয়ন ওয়ার্কার্স কমিশনের ডাকে ৩০০০০০ এরও বেশী শ্রমিক-কর্মচারী সরকারের শ্রমিক-বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল আইনের বিরুদ্ধে দেশের ৪৫টি শহরে প্রতিবাদ দিবস পালন করে। প্রতিবেশী পর্তুগালে, আলেন্টেজো ও রিবাটেজো প্রদেশে ৮০,০০ যৌথ খামারের কৃষক ও কৃষিশ্রমিকরা সেই বছর জুলাই মাসে কৃষি সংস্কারের জন্য একদিনের সংগ্রাম করে। "যে সরকার শাসন করতে পারে না" তার বিরুদ্ধে ইটালীতে ১৯৮০ সালের জানুয়ারির মাঝামাঝি ১ কোটি

---

* ৮১ হিউম্যানিটে, ১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৮০।

** বিস্তারিত জানার জন্য এই সংখ্যার অন্যত্র দেখুন।

৪০ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষ জাতীয় প্রতিবাদ ধর্মঘট পালন করে। এব্যাপারে লা উনিতা লেখে, "এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, বিক্ষোভ মিছিলগুলো সরকারি নীতির বিরুদ্ধে একটি পরিষ্কার প্রতিবাদ, যা ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে অপেক্ষা করতে বাধ্য করে কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনো উত্তর পায় নি।"*

শ্রেণী সংগ্রামের তীব্রতা আরও দেখা যাবে এই ঘটনা থেকে যে পুলিস প্রায় প্রতিটি ধর্মঘটে হস্তক্ষেপ করেছে। ধর্মঘটীদের ওপর অকথ্য অত্যাচার করা হয়েছে, যেমন ১৯৭৯ সালের সেপ্টেম্বরে রটারডামে ডক শ্রমিক ও মার্শাইয়ের শ্রমিকদের ওপর এবং ১৯৮০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শেফিল্ডের শ্রমিকদের ওপর। এবছরের ফেব্রুয়ারি মাসে তুরস্কের তারিশ এগ্রো-ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সের ধর্মঘটে যোগদানকারীদের ওপর বর্বর অত্যাচার চালানো হয়।

প্রলেটারীয় সংহতি পুঁজিবাদী দেশগুলোর সংগ্রামের মাপকাঠি। এই ধরনের সংহতি শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন চিহ্নিত করে। ১৯৭৯ সালের জুন মাসে ১৫ লক্ষ শ্রমিক ও কর্মচারী গ্রেপ্তার-করা ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের সংহতিতে সাধারণ ধর্মঘট করে। ১৯৭৯ সালে ডক শ্রমিকদের ধর্মঘটের সময়ে হাজার হাজার ডাচ শ্রমজীবী মানুষ ধর্মঘটীদের সমর্থনে দাঁড়ায়। এই বছরের প্রথম দিকে ব্রিটেনে ইস্পাত শ্রমিকদের ধর্মঘটের সময়ে শ্রেণী-সংহতি বিশেষভাবে দেখা যায়, যখন রেল শ্রমিক, ডক শ্রমিক ও অন্যান্যরা ইস্পাত শ্রমিকদের সমর্থনে দাঁড়ায়।

ধর্মঘটীদের প্রস্তুতি ও সাহস, তাদের শ্রেণীভ্রাতাদের কাছ থেকে সংহতির ভরসা পুঁজির বিরুদ্ধে শ্রেণী সংগ্রামে সাফল্যের চাবিকাঠি। শ্রমজীবী মানুষের ধর্মঘটের ফলে উচ্চতর মজুরি, কাজের ভালো অবস্থা ও ছাঁটাই কর্মীদের পুনর্বহাল করা যায়।

এই ধরনের একটি সাফল্যের ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে ফরাসী কমিউনিস্টদের মুখপাত্র লা হিউম্যানিটে ১৯৭৯ সালের শরৎকালে লেখে, "যে সংগ্রামে ঐক্য গড়ে ওঠে, জয়ের আভাস পাওয়া যায়, শ্রমজীবী জনগণ ও জাতির অন্যান্য অংশের পক্ষে রাজনৈতিক অবস্থা পাল্টায় এবং

---

* লা' উনিতা, ১৫ই জানুয়ারি, ১৯৮০।

প্রকৃত পরিবর্তনের পক্ষে পথ করে দেয়, সেইসব সংগ্রামের মধ্যেই ভবিষ্যৎ নিহিত।"*

শ্রমজীবী জনগণের সংগ্রামের পুরোভাগে কমিউনিস্টরা থাকে, একচেটিয়ার ক্ষমতা ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে অনমনীয় যোদ্ধা কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টি-গুলো শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে, গণতন্ত্র, শান্তি ও সমাজতন্ত্রের স্বার্থে উৎসর্গীকৃত।

ডব্লু. এম আর তথ্য বিভাগ

* লা হিউম্যানিটে, ২৬শে নভেম্বর, ১৯৭৯।

MCNDEP-2008

Vol. 8 No. 5 SANTI SWADHINATA Regd. N
May, 1980 SAMAJTANTRA WB/EC 1

শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র পত্রিকার নিয়মাবলী

গ্রাহক সংক্রান্ত

15 JU

প্রতি সংখ্যা এক টাকা।
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা : দশ টাকা।
বছরের যে-কোনো সময় থেকে গ্রাহক হওয়া যায়
ডাক খরচ আমাদের।

এজেন্সি সংক্রান্ত

৫ কপির কমে এজেন্সি দেওয়া সম্ভব নয়।
কমিশনের হার শতকরা ২৫ টাকা।
পত্রিকা ভি. পি-তে পাঠানো হয়।
ডাক খরচ আমাদের।

যোগাযোগ ক
কর্ম
শান্তি স্বাধীনতা সমাজত
৪/৩এ, ওরিয়েন্ট
কলকাতা
ফোন : ৪৪-৮